দাম : ষোলো টাকা

মহাকুম্ভকে অসম্মান করে নিজেদের স্বরূপ উন্মোচন করেছে রাষ্ট্রবিরোধীরা
— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

ভারতীয় নির্বাচনে বিদেশি অর্থের করালগ্রাস
— পৃঃ ১৭

৭৭ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ১৭ মার্চ, ২০২৫।। ৩ চৈত্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

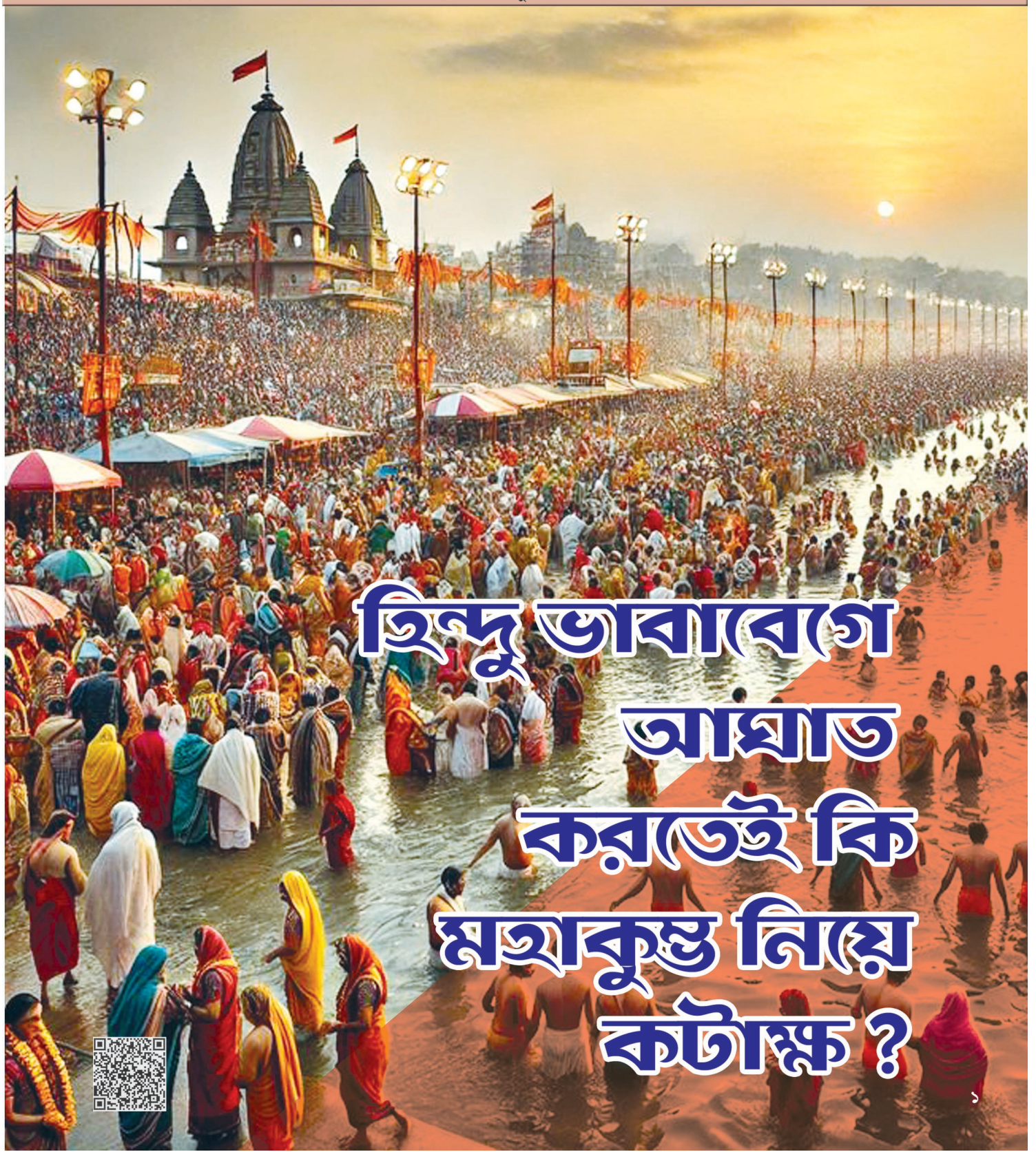

হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করতেই কি মহাকুম্ভ নিয়ে কটাক্ষ ?

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ৩ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৭ মার্চ - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

দেশবিরোধীদের ভয়ে যে মন্ত্রী পালায় তার জেলে থাকাই উচিত : ভবানীপুর থেকে যাদবপুর ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

টাকা ভাইপো, ভাইপো টাকা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্তিবিলাসে আচ্ছন্ন দুই শক্তিধর ◻ রাহুল পাওয়া ◻ ৮

মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের হামলার শিকার হিন্দুরা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভমেলায় কে কী পেলেন? ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

মহাকুম্ভকে অসম্মান করে নিজেদের স্বরূপ উন্মোচন করেছে রাষ্ট্রবিরোধীরা ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৩

বাঙ্গালি হিন্দুদের খতম করার ডাক রাজ্যের জেহাদি নেতৃত্বের ◻ রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৫

ভারতীয় নির্বাচনে বিদেশি অর্থের করালগ্রাস ◻ অর্ণব কুমার দে ◻ ১৭

তদন্ত সাপেক্ষে চিহ্নিত করা ভুয়ো ভোটারদের ফর্ম নম্বর ৬ পরীক্ষা করা হোক ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ২০

হিন্দু তাচ্ছিল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে মমতার মুখে 'মৃত্যুকুম্ভ' ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৩

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ : অমৃতের স্পর্শ কমিউনিস্টরা কোনোদিন পাবেন না ◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻ ২৫

আধুনিক ভারতের নির্মাতা ডাক্তারজী ◻ সোমকান্তি দাস ◻ ৩১

পূর্ণমহাকুম্ভ : এক অখণ্ড ভারত দর্শন ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৩৫

মহাকুম্ভে জাগ্রত হয়েছে এক নতুন ভারত ◻ দীপ্তাস্য যশ ◻ ৩৬

দেশ, জাতি, সমাজ রক্ষার্থে হিন্দু ঐক্য বিশেষ জরুরি ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৩৮

বিবিধতার মাঝে একতাই সত্য : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ◻ ৪৩

বাংলাদেশ কোন পথে যেতে চায়, তা স্পষ্ট হচ্ছে ◻ ৪৭

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
২৪ মার্চ
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৪ মার্চ
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাষ্ট্রবিরোধীদের কুনাট্য

সম্প্রতি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে উত্তাল হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে জোরালো হয়েছে দোষারোপ ও পাল্টা দোষারোপের পালা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই বাম ও অতিবামপন্থীদের আখড়া। শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নয়, প্রেসিডেন্সি, দিল্লির জেএনইউ-ও দেশবিরোধী বামপন্থার আঁতুড়ঘর। এদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধীতা, দেশকে অশান্ত করে তোলা। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিক যাদবপুরের আন্দোলনেও। রাষ্ট্রবাদী শক্তির উত্থান রুখতে, বাংলাদেশে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন থেকে নজর ঘোরাতে এখানেও উঠেছে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা সহজ নহে

ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর আক্রমণ কোনো নূতন কথা নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই আক্রমণ চলিয়াছে। ইসলামি শাসনকালে তাহা চরমতম পর্যায়ে উঠিয়াছিল। ইসলামি আক্রমণকারীরা দেবালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সম্ভ্রমহানি করিয়াছে, দেশবাসীকে ধর্মান্তরিত করিয়াছে। এই কার্যে আক্রমণকারীদের দোসর হইয়াছিল পঞ্চমবাহিনী রূপে পির-ফকির-দরবেশ, মোল্লা- মৌলবির দল। ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হইবার পর শাসক অনুগ্রহে প্রবল উৎসাহে তাহারা এই কার্য করিয়াছে। ইসলাম ভারতবর্ষে আসিয়াছে এক হস্তে কোরান আর এক হস্তে তরবারি লইয়া। কাপুরুষ, লোভী ও ভীরুরা তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ধর্মান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু স্বাভিমানসম্পন্ন হিন্দুগণ দেশ-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সতত মরণপণ লড়াই করিয়াছেন। কাশ্মীরের ললিতাদিত্য মুক্তপীড় হইতে পৃথ্বীরাজ চৌহান, গুরু গোবিন্দ সিংহ, রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, ছত্রপতি শম্ভাজী, রানি দুর্গাবতী-সহ বহু বীর ও বীরাঙ্গনা ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। ইহার পর বণিকের ছদ্মবেশে ধূর্ত ইংরাজ আসিয়াছে। দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তাহারা এই দেশ শাসন করিয়াছে। তাহারা পর্যালোচনা করিয়াছে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অত্যাচারী ইসলামি শাসনে রহিয়াও হিন্দুজাতি নিঃশেষ হয় নাই। ইহার কারণ কী? রাজশক্তি হারাইলেও কীভাবে রাষ্ট্রবোধ তাহাদিগের প্রখর রহিয়াছে? এত প্রাণশক্তি তাহারা কোথা হইতে পাইয়াছে? এত উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী ইহারা কীভাবে হইয়াছে? বহু পর্যালোচনা করিয়া অবশেষে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শিক্ষা সচিব টমাস ব্যাবিংটন মেকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতীয়দিগের প্রাণশক্তির আধার হইল তাহাদিগের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতি অগাধ নিষ্ঠা ও জ্ঞান। মেকলে সাহেব ভারতবাসীর এই প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্য ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টান ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইংরাজ শাসক সেই ভাবধারায় এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল, যাহারা বর্ণে ও রক্তে ভারতীয় থাকিলেও রুচি, মানসিকতা ও সংস্কৃতিতে হইবে ইউরোপীয়। যাহারা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি, বেদ-পুরাণ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারতকে মিথ্যা ও কাল্পনিক বলিয়া প্রচার করিয়া ভারতীয় জাতির উন্নত চরিত্রের অবনমন ঘটাইবে। মেকলে তাহার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এমন সম্ভাবনার বীজ রোপিত করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ইংরাজ সাম্রাজ্যকে নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব উভয়ই প্রদান করিয়াছিল। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, মেকলে সাহেবের পরিকল্পনা বহুলাংশে সফল হইয়াছে। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লির জেএনইউ, উত্তরপ্রদেশের আলিগড় ইউনিভার্সিটি তাহার স্বর্ণ ফসল। ভারতের সেকু-মাকুরা সেইগুলিরই উপজাত সন্তান,ভারত বিরোধিতাই যাহাদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা।

মেকলে সাহেবের পরিকল্পনানুযায়ী সেই মেকলেপুত্ররা অদ্যাবধি দেশবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত। এই কার্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে কমিউনিস্টরা। তাহারাই মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করিয়া দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদন ঘটাইয়াছে। মুসলিম লিগ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। ইহাদের দাবি ছিল ভারতবর্ষকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিবার। ইহাদেরই মদতপুষ্ট তথাকথিত ঐতিহাসিকরা দেশের গৌরবময় ইতিহাস গোপন করিয়াছেন। অত্যাচারী ইসলামি শাসনকে সুশাসন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেশ-জাতি-সমাজ-সংস্কৃতির উজ্জীবনকে ইহারা সহ্য করিতে পারেন না। দেশের গৌরবগাথা ইহাদের নিকট বিষতুল্য। সম্প্রতি প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলায় ৬৬ কোটি হিন্দুর মহামিলনকে ইহারা বিষনজরে দেখিয়াছেন। জাতীয় সংহতির এই বিশাল আয়োজনকে ইহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। ইহাদের দোসর রাজনৈতিক দলগুলির মেকলেপুত্ররাও মহাকুম্ভমেলাকে নানাভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহারা নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথের বিরোধিতা করিতে করিতে রাষ্ট্র বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। ইতিহাস সাক্ষী, হিন্দু ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে যাহারা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। কমিউনিস্টরা ধ্বংস হইয়াছে, কংগ্রেস ধ্বংসের পথে আর কোটি কোটি হিন্দুর আস্থা ও বিশ্বাসের মহাকুম্ভকে যিনি মৃত্যুকুম্ভ বলিয়াছেন, তাহারও ধ্বংস অনিবার্য। ভারতীয় সংস্কৃতি শাশ্বত, অমর, অটল। তাহাকে ধ্বংস করা সহজ বিষয় নহে। হাজার বৎসরের আক্রমণেও ইহাকে ধ্বংস করা যায় নাই।

সুভাষিতম্

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।

লঘুচিত্তের মানুষরাই আপন-পর ভেদ করে, কিন্তু উদার চিত্তের মানুষেরা সমগ্র বিশ্বকেই নিজের আত্মীয় বলে মনে করেন।

দেশবিরোধীদের ভয়ে যে মন্ত্রী পালায় তার জেলে থাকাই উচিত

ভবানীপুর থেকে যাদবপুর

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

যত কাণ্ড দক্ষিণ কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মভূমি। মমতা ওই এলাকার মেয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস (ভ) বা ভবানীপুর রাজ্য চালায়। ভবানীপুর এখন ভণ্ডপুর আর কিছু দূরে দেশ বিরোধী বুড়ো খোকাদের বাড়ি যমপুর (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নাম)। উপাচার্য গোপাল সেনের পর স্বপ্নদীপকে তারা হত্যা করে। এই যমপুরের বিনাশ হওয়া উচিত। ভাড়াটিয়া শিক্ষিতদের নিয়ে তৈরি যমপুরের উৎখাত দরকার। অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক জীবনে মমতা উত্তর কলকাতায় রাজনীতি করেননি। ছ'বারের সাংসদ কখনো সাহস করে উত্তর কলকাতার বনেদিয়ানার কাছে পরীক্ষা দেননি। দক্ষিণ ছেড়ে নন্দীগ্রামে লড়তে গিয়ে ল্যাজে গোবরে হয়ে ফিরেছেন। গুজরাট ছেড়ে বারাণসী থেকে জিতে নরেন্দ্র মোদী প্রমাণ করেছেন কেন তিনি ভারতের সবচাইতে জনপ্রিয় রাজনৈতিক মুখ। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই ঘটনা বিরল।

রাহুল গান্ধী আমেথিতে হেরে পালিয়ে কেরলে জিতেছেন। মমতা নন্দীগ্রামে হেরে ভবানীপুরে এসে জেতেন। ১৯৮৯ সালে যাদবপুরে হেরে মমতা দক্ষিণেই কেন্দ্র পালটেছিলেন। উত্তরে যাননি। য পলায়তি স জীবতি। বোকা ব্রাত্য বলে মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বদনামটা অনেকদিন থেকেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একবার জেল খাটা আরাবুল ইসলামের তুলনা করেছিলেন। মমতাকে এমন পুরস্কার দিয়েছিলেন যার অস্তিত্বই নেই। যমপুরীতে কিছু দেশবিরোধীর তাড়া খেয়ে ভয়ে পালাতে গিয়ে এক ছাত্রকে গাড়ি চাপা দিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন। উত্তরপ্রদেশে এক মন্ত্রীপুত্র এই কুকীর্তি করে জেল খেটেছেন। তাই কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রাত্যরও জেলে থাকা উচিত। ব্রাত্যবাবু রেহাই পেয়ে গেলে এটা প্রমাণ হবে মমতা জমানায় মন্ত্রীরা গাড়ি চাপা দিলে কোনো শাস্তি হয় না। আদালতের নির্দেশে পুলিশের খাতায় তার নাম উঠেছে তবে গ্রেপ্তার হননি। তৃণমূল শাসনে জেল বা পুলিশ হেফাজত দলীয় কার্যালয় হয়ে গিয়েছে। ব্রাত্যবাবুর জেল দাবি করলেও বলতে পারব না যে সেটাই হোক।

দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় একই দলের তিন নেতার চুলোচুলি প্রমাণ করে রাজ্য শাসনে কারা অযোগ্য। মমতা, অভিষেক আর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ক্রস কানেকশন বা বিপরীত তরঙ্গের কিছু প্রকাশ কর্মীসভার মঞ্চে মালা পরানো আর চড়ানোর মধ্যে দিয়ে বোঝা গিয়েছিল। ঝগড়া মেটাতে ৩২ সদস্যের কমিটি গড়েও মমতা তা স্থগিত করে দেন। এই মুহূর্তে নতুন অঙ্কে ভাঙাচোরা তৃণমূলকে গড়ে তোলা মুশকিল। তাছাড়া চার্জশিটে নাম থাকা অভিষেক যেকোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার হতে পারেন। মৌলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রকে অনুদানের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন মমতা। তাতে তিনি যে খানিকটা সফল তার প্রমাণ ২০২১ আর ২০২৪-এর নির্বাচন। আনুমানিক ৯০টি সামাজিক প্রকল্প রাজ্যের মানুষকে মমতা নির্ভর করে তুলেছে। দুর্নীতি বা ইসলামিক জেহাদের ইস্যু ছাড়াও বিকল্প সামাজিক নীতি মমতাকে বেসামাল করতে পারে। কাজ না করে অর্থোপার্জনের অনৈতিক সুযোগ মমতা রাজ্যের কিছু মানুষকে করে দিয়েছে। তাতে সরকারি তহবিল খালি হয়ে ঋণের বোঝা আটগুণ বেড়েছে।

> রাজ্য জুড়ে ভুয়ো ভোটারের ছড়াছড়ি ধরা পড়ছে। বেশিরভাগ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমান। মমতার পৃষ্ঠপোষকতায় এই ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে।

মমতার অবশ্য ভোট বেড়েছে। মমতা দাবি করতেন তিনি 'ভূতের মতো' কাজ করেন আর ক্ষমতায় আসার পর প্রথম একশো দিনের মধ্যে সব কাজ করে ফেলেছিলেন। রাজ্য জুড়ে ভুয়ো ভোটারের ছড়াছড়ি ধরা পড়ছে। বেশিরভাগ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমান। মমতার পৃষ্ঠপোষকতায় এই ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে। রাজ্যে মুসলমান ভোটার আনুমানিক হার ২১.০৭ শতাংশ হলেও ওই সম্প্রদায়ের হয়ে মমতার বাক্সে ভোট পড়ে প্রায় ৩২ শতাংশ। এই বিশাল অঙ্কের বাড়তি বেআইনি ভোট মমতাকে এগিয়ে রাখে। মমতা তাই অনুপ্রবেশ বিরোধী সমস্ত পদক্ষেপের বিরোধী আর তা দেশবিরোধী হলেও তাতে মমতা গররাজি। ভবানীপুরের দৈনিক রাজনৈতিক খেউড় নজর ঘোরানোর খেলা। তবে যাদবপুরের দেশবিরোধী পরিবেশ ছোঁয়াচে। ব্রাত্যবাবু অন্তহীন মমতা স্তাবক। রুখে দাঁড়াবার আর সাহস নেই। শুনেছি একসময় দেশবিরোধী বিদেশি অতিবামপন্থী ভাবনায় তিনিও জারিত ছিলেন। আজ চোখদুটো তার কালো চশমায় ঢাকা। তাই ভবানীপুর আর যাদবপুরের ফারাক করতে পারছেন না।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

টাকা ভাইপো, ভাইপো টাকা

স্নেহদাত্রীষু দিদি,

সম্বোধনটা জানি আপনার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি জানতাম হবে। কারণ, ভাইপোটাকে আপনি এত স্নেহ করেন, এত স্নেহ করেন যে তা বলার কথা নয়। সে ভালো। ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্না-ভাগ্নিরা তো আদরেরই ধন। কিন্তু দিদি তার মধ্যে আপনার গুণধর সাংসদ ভাইপোটি আবার বেশি স্নেহের। কারণ, ওঁর ছায়ার নাম টাকা। সত্যি করেই টাকা ওঁর ছায়াসঙ্গী।

এই যে কাকুর এবং অন্যান্যদের কণ্ঠস্বর থেকে যা পাওয়া গিয়েছে তাতে তো আপনার ভাইপোটি কোটি ছাড়া কথাই বলেন না। তিনি আবার রাফলি ১৫ কোটিতেই খুশি। যদিও তাঁর টাকা লাগে অনেক বেশি। সেসবও রয়েছে। আমি দিদি শুনিনি তবে যেটা পড়েছি তাতেই আমারও আপনার ভাইপোর প্রতি স্নেহ উথলে উঠছে।

দিদি, সিবিআইয়ের চার্জশিটে প্রায় সওয়া এক ঘণ্টার কথোপকথন রয়েছে। ঠিকঠাক হিসাব করলে ৭২.৫৯ মিনিট। মোট সাত জনের কণ্ঠস্বর। ছ'জন মানুষ আর একটি তোতাপাখি। সেই কথোপাকথনে মোট ৭৩ বার শোনা গিয়েছে কখনো 'অভিষেক' আবার কখনো 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়' নামটি।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র বেহালার বাড়িতে ২০১৭ সালে এই কথা হয়। নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন তাঁর বেতনভুক কর্মী অরবিন্দ রায়বর্মণ। অরবিন্দ সিবিআইয়ের জেরায় দাবি করেন, কুন্তলেরই নির্দেশে সেদিনের কথোপকথন নিজের মোবাইলে লুকিয়ে রেকর্ড করেছিলেন। পরে সেই কথোপকথন নিজের ল্যাপটপে চালান করেছিলেন। টেট দুর্নীতির তদন্তে নেমে সেই ল্যাপটপ থেকে ওই অডিয়ো রেকর্ডিং উদ্ধার করে সিবিআই। সেই পুরো কথোপকথনটি লিখিত আকারে তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিটের সঙ্গে আদালতে পেশ করেছে সিবিআই।

সিবিআইয়ের হাতে যে অডিয়ো এসেছে, তাতে সুজয়কৃষ্ণকে বলতে শোনা গিয়েছে, অভিষেক ১৫ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন। সেই টাকা জোগাড় করার জন্যও কুন্তল, শান্তনুদের সঙ্গে পরিকল্পনা করছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। ২৫০ জনের থেকে টাকা তুললে ১৫ কোটি জোগাড় করা যাবে বলে জানান সুজয়কৃষ্ণ। সেখানে সুজয়কৃষ্ণ বলছেন, 'কালীঘাট অফিসে ঢুকে অভিষেক বলল, ১৫ কোটি টাকা দিয়ে দাও। আমি বললাম, স্যার, টাকা কেউ দেবে না। দু'বার করে কি টাকা দেবে? সাড়ে ছ' লক্ষ করে টাকা দিয়েছে, আবার টাকা দেবে!... অভিষেক বলেছে, কারা এটা করেছে নাম দাও আমাকে। এবার আমি দেখো, এবার আমি তো কোনো ভাবেই কুন্তল, অরবিন্দের নামটা বলব না। এটা তো গ্যারান্টি। আমি তো এই জন্য বলছি একবার দেখা করতে। এবার ওকে বুঝিয়ে বললাম দুটো, দেখো এই ব্যাপার।'

সুজয়কৃষ্ণ কিছু সময় পরে আবার বলছেন, 'অভিষেক রাফলি ১৫ কোটিতে খুশি। শান্তনু, অভিষেক ১৫ কোটিতেই খুশি। এখন ২৫০ লোক করলে ১৫ কোটি পেয়ে যাব। ঠাণ্ডা মাথায় মন দিয়ে বলো। আমি ২৫০ লোক করলে ১৫ কোটি পেয়ে যাব।... শুধু মানিক ভট্টাচার্য কাজটা করবে। মানিক ভট্টাচার্য জানবে। পার্থ চ্যাটার্জির মুখে সেলোটেপ মেরে দেবে। অভিষেক ব্যানার্জির জানার স্কোপ জিরো।'

এখানেই শেষ নয় দিদি। সুজয়কৃষ্ণ কিছু সময় পরে আবার বলছেন, 'অভিষেক রাফলি ১৫ কোটিতে খুশি। শান্তনু, অভিষেক ১৫ কোটিতেই খুশি। এখন ২৫০ লোক করলে ১৫ কোটি পেয়ে যাব। ঠাণ্ডা মাথায় মন দিয়ে বলো। আমি ২৫০ লোক করলে ১৫ কোটি পেয়ে যাব।... শুধু মানিক ভট্টাচার্য কাজটা করবে। মানিক ভট্টাচার্য জানবে। পার্থ চ্যাটার্জির মুখে সেলোটেপ মেরে দেবে। অভিষেক ব্যানার্জির জানার স্কোপ জিরো।'

ওই কথোপকথনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি আছে বলে সিবিআই তাদের চার্জশিটে উল্লেখ করেছে। সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পরে দিদি, অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসু বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন, সিবিআই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাঁর মক্কেলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার মরিয়া চেষ্টা করছে। অভিষেক নিজেও নেতাজী ইন্ডোরে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা থেকে ওই বিষয়ে সিবিআইকে পালটা আক্রমণ করেছিলেন। তখন তো দিদি আপনি পাশেই ছিলেন। ওই খবরের সূত্র ধরে ভাইপো বলেছিলেন, 'চার্জশিটে দু'বার আমার নাম আছে। কিন্তু কোনো পরিচয় নেই। সিবিআই ভাববাচ্যে কথা বলছে কেন? এই অভিষেক কে?' আমারও প্রশ্ন দিদি, এই অভিষেক কে? পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আপনার দলে এমন অভিষেক আর কে রয়েছেন? □

অতিথি কলম

রাহুল পাওয়া

শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্তিবিলাসে আচ্ছন্ন দুই শক্তিধর

ডিপসিক (DeepSeek), বিশেষত এর 'আর-ওয়ান' মডেলটি প্রযুক্তিক্ষেত্রে প্রথম সারির মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলির চেতনার জগতে সম্প্রতি একটি মৃদু কম্পন সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এই কম্পন এআই দুনিয়ায় যেন দ্রুত একটি ঝড়ে পরিণত হয়েছে। চীন আবিষ্কৃত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি হলো ডিপসিক, যা কয়েকদিন আগে বিশ্বের সামনে নিয়ে এসেছে 'ডিপসিক এআই' নামক একটি চীনা কোম্পানি। মানব বুদ্ধিমত্তার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদানকারী ডিপসিককে মার্কিন কোম্পানি ওপেন এআই আবিষ্কৃত এআই চ্যাটবট 'চ্যাটজিপিটি' (ChatGPT)-র 'ওপেন সোর্স অল্টারনেটিভ' বা উপযুক্ত বিকল্প বলে ধরে নিচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহল। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সফট্ওয়্যার। 'ওপেন সোর্স'-এর অর্থ হলো— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফট্ওয়্যার তৈরিতে ব্যবহৃত কোড, অ্যালগোরিদম্ এবং সংশ্লিষ্ট এআই সিস্টেমের মডেলটি যেকোনো গবেষকের কাছে সহজলভ্য। অর্থাৎ, যা কোনো প্রোপ্রাইটরি এআই মডেল, অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট সংস্থার মালিকানাধীন পণ্য বা পরিষেবা, অথবা তাদের কুক্ষিগত বিষয় নয়। চীন উদ্ভাবিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি 'ডিপসিক' -এর অসাধারণ দক্ষতা আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়া-স্থিত বিশ্বের তথ্য-প্রযুক্তি কেন্দ্র সিলিকন ভ্যালিকে যেন কাঁপিয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তি যেন হয়ে উঠেছে আধুনিক যুদ্ধের একটি অস্ত্র। নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে চলছে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দুই যুযুধান ক্ষমতাধরের মধ্যে অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা। প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা এই প্রতিযোগিতার আরেকটি অধ্যায়ের সূত্রপাতের লক্ষ্যে অপেক্ষমান। কিন্তু এক্ষেত্রে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের টপকে যাওয়ার মতো বিষয় বলে মনে হলেও প্রকৃত সত্য তা নয়। এই প্রতিযোগিতার পরিণতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দু'টি বৃহৎ শক্তির মধ্যে কোনো একজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মধ্যে নিহিত নয়। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মুক্ত গবেষণা এবং 'ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্ট', অর্থাৎ ওপেন সোর্স সংক্রান্ত প্রকৌশল উদ্ভাবনের প্রভাব বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। এই প্রতিযোগিতার পরিণাম হলো ওপেন সোর্স বিশিষ্ট প্রযুক্তি সমূহের বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব। প্রতিযোগিতার বাজারে 'ওপেন সোর্স' সম্পন্ন প্রযুক্তিগুলি প্রোপ্রাইটরি এআই মডেলগুলিকে অতি দ্রুত পিছনে ফেলে দিচ্ছে।

বহু বছর ধরে সিলিকন ভ্যালিতে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, এআই-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে তার স্কেল (পরিব্যাপ্তি) ও পরিকাঠামোর ওপর। 'জেনারেটিভ প্রি-ট্রেনড্ ট্রান্সফর্মার' (জিপিটি) মডেল আধারিত ওপেন এআই নির্মিত চ্যাটজিপিটি হলো সিলিকন ভ্যালি অনুসৃত পদ্ধতিরই প্রতিফলন। সুবিশাল ডেটাসেট (তথ্যরাশি) সমৃদ্ধ এবং মানব-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (রি-ইনফোর্সমেন্ট লার্নিং ফ্রম হিউম্যান ফিডব্যাক, সংক্ষেপে আরএলএইচএফ) হওয়ার দরুন উত্তরোত্তর নিজের মুন্সিয়ানা বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলা চ্যাটজিপিটি-র ক্ষেত্রে তার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য প্রচুর কম্পিউটেশনাল রিসোর্সের প্রয়োজন ছিল। কম্পিউটেশনাল রিসোর্স বলতে কম্পিউটার সিস্টেমের হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যারের উপাদানগুলিকে বোঝায় যা গণনার কাজ (ক্যালকুলেশন) এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (ডেটা-প্রসেসিং)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। জটিল ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচার-সংবলিত হওয়ার মাধ্যমে চ্যাটজিপিটি বুঝিয়ে দেয় যে এর সঙ্গে সবকিছুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহই— তার সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়কে সদা-সক্রিয় রাখে। কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তার প্রয়োজন ডেটা সেন্টার (তথ্যকেন্দ্র), উপযুক্ত পরিমাণ কম্পিউট পাওয়ার (কম্পিউট পাওয়ার হলো একটি কম্পিউটারের ডেটা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা) এবং উচ্চমানের জিপিইউ বা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটস্।

এই অতিরিক্ত সম্পদ নির্ভরতার দরুন বড়ো মাপের এআই প্রযুক্তি সমূহ উদ্ভাবনের বিষয়টি টেক-জায়ান্টদের (অর্থাৎ, তথ্য- প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বৃহৎ কোম্পানিগুলির) একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বময় এই ধারণা ছিল যে, বিলিয়ন (কয়েকশো কোটি) ডলার বাজেট-বিশিষ্ট এবং অত্যাধুনিক পরিকাঠামো-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এআই মডেল তৈরিতে সক্ষম। ধারণার মূল কেন্দ্রবিন্দুটি ছিল এই যে, এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে যারা মালিকানাধীন প্রযুক্তি শিল্প পরিকাঠামো (প্রোপ্রাইটরি আর্কিটেকচার) এবং ডেটা ইকোসিস্টেমে সর্বাধিক বিনিয়োগ করতে পারবে। ডেটা ইকোসিস্টেম হলো নানা প্রক্রিয়া, সরঞ্জাম এবং ডেটা সোর্স (তথ্যের উৎস) সমন্বিত একটি নেটওয়ার্ক যা একইসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ, সঞ্চয় ও বিশ্লেষণের কাজ করে।

সবচেয়ে বড়ো কর্পোরেট ল্যাবের মালিক বা সবচেয়ে বেশি কম্পিউটিং রিসোর্সের অধিকারীর উপর এআই ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে না। এআই-এর দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহী, এই সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণে ইচ্ছুক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় আগ্রহীরাই আগামীদিনে হতে চলেছে এআই ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক।

এর পরবর্তী পর্যায়ে আবির্ভূত হয়েছে ডিপসিক। ডিপসিকের আগমন প্রোপ্রাইটরি মডেলসমূহের কাছে যেন এক বিষম ব্যাঘাত স্বরূপ। চ্যাটজিপিটি-র জটিল ট্রান্সফর্মার কাঠামোর বিপ্রতীপে ডিপসিক একটি ভিন্ন ধরনের আর্কিটেকচার ব্যবহার করে। চ্যাটজিপিটি-র মতো

প্রোপ্রাইটরি (কোম্পানি মালিকানাধীন) মডেলগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বড়ো মাপের তথ্য-প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো। ডিপসিক এমন একটি প্রক্রিয়ায় চলে যা প্রতিটি কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক সাব (উপ)-নেটওয়ার্কগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। সমস্ত মডেল প্যারামিটারগুলিকে (অর্থাৎ, এআই মডেলের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে) একত্রে ব্যবহারের পরিবর্তে কেবলমাত্র কিছু বিশেষ নেটওয়ার্কের সাবসেটকে তার কাজের ক্ষেত্রে নির্বাচন করে ডিপসিক। ফলে তার উচ্চ কর্মক্ষমতা বজায় থাকে। একই সঙ্গে কম্পিউটেশনাল ব্যয় অদ্ভুতভাবে হ্রাস করে ডিপসিক। এই কর্মদক্ষতা ডিপসিককে চ্যাটজিপিটি-র মতো প্রোপ্রাইটরি মডেলগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য ছাড়াই অত্যাধুনিক এআই পরিষেবা দানে সক্ষম করে তোলে। প্রোপাইটরি মডেলগুলির জয়যাত্রায় ব্যাঘাতের কারণটি কেবল ডিপসিকের প্রযুক্তিগত নকশায় নিহিত নেই। যে প্রক্রিয়ায় ডিপসিক জন্মগ্রহণ করেছে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে এর সূত্র নিহিত রয়েছে।

কোনো গোপনীয় বিষয়োদ্ভূত ব্যাপার নয় ডিপসিক। কোনো গোপন সরকারি গবেষণাগার বা চূড়ান্ত গোপনীয়ভাবে সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে তৈরি হয়নি ডিপসিক। এইসব কিছুর বিপ্রতীপে বিভিন্ন ওপেন সোর্স-উপকরণ এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত নানা গবেষণালব্ধ ফলাফল আধারিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো ডিপসিক এআই। জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীর অধিকাংশই পশ্চিমি দেশগুলি হতে উদ্ভূত। ডিপসিকের ভিত্তি কিন্তু চীনা উদ্ভাবনী শক্তি নয়। ওপেন সোর্স এআই-কেন্দ্রিক গবেষণাই হলো ডিপসিকের মূল ভিত্তি। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে 'ল্যাঙ্গোয়েজ' মানে হলো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গোয়েজ, অর্থাৎ যে ভাষা কম্পিউটার বোঝে এবং যা অনুযায়ী কম্পিউটার কাজ করতে পারে। মেটা (পূর্বের নাম ফেসবুক) এআই দ্বারা সৃষ্ট ওপেন সোর্স-ল্যাঙ্গোয়েজ মডেলগুলির সমষ্টিগত একক হলো— মেটা লামা। ওপেন সোর্স বিশিষ্ট বড়ো মাপের ল্যাঙ্গোয়েজ মডেল হলো মেটা লামা, যা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ওপেন সোর্স সংবলিত এই ল্যাঙ্গোয়েজ মডেলটির আর্কিটেকচারটি সহজলভ্যও বটে। মেটা লামাকে তার কাজে লাগিয়েছে ডিপসিক। মেটা লামার মতোই এআই উদ্ভাবনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও সহজপ্রাপ্য একটি উপকরণ হলো মার্কিন গবেষকদের দ্বারা তৈরি পাইটর্চ (PyTorch)। পশ্চিমি দেশগুলির তথ্য-প্রযুক্তি গবেষণাক্ষেত্র সম্ভূত এবং এআই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাপত্রে প্রকাশিত এআই সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান ডিপসিক এআই উদ্ভাবনে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে বিচার করলে এআই সংক্রান্ত কোনো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তছরুপের প্রয়োজন চীনের নেই। যে বিষয়গুলি বিনামূল্যে, অবাধে সহজলভ্য, সেগুলি চীন ব্যবহার করেছে। সেগুলির প্রয়োগ করে তুলেছে উন্নততর। এআই প্রযুক্তিরই উন্নততর সংস্করণ বা অপ্টিমাইজড্ ভার্সন হয়ে উঠেছে 'ডিপসিক এআই'। এটাই মার্কিন সিলিকন ভ্যালির অস্বস্তির মূল কারণ। ডিপসিক যদি 'ওপেন সোর্স সম্পন্ন এআই প্রযুক্তি' উদ্ভাবনের লক্ষ্যে হওয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে, সেখানে কিছু পরিমার্জন-পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি বড়ো মাপের এফিশিয়েন্ট (কর্মদক্ষ) মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে সর্বাধিক ডেটাসেট (তথ্যভাণ্ডার) বা কম্পিউট পাওয়ার (গণনার ক্ষমতা) ইত্যাদি কার বা কাদের করায়ত্ত— এই বিষয়গুলির উপর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটি আর নির্ভর করবে না। পশ্চিমি বিশ্ব এআই প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণে যে অসমর্থ বা এআই প্রযুক্তি সমূহ যে পশ্চিমি দুনিয়ার বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির কুক্ষিগত, একচেটিয়া কোনো বিষয় আর নয়— এই ভাবনাটি বর্তমান বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের ভিতও নাড়িয়ে দিচ্ছে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা।

'ডিপসিক' হলো এই বিশ্বজনীন ট্রেন্ডের প্রমাণ স্বরূপ। অ্যাজিলিটি (কর্মকুশলতা), অ্যাক্সেসিবিলিটি (অধিগত হওয়ার প্রক্রিয়া বা অধিগম্যতা) ও এফিশিয়েন্সি (দক্ষতা)— প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডিপসিকের মতো ওপেন সোর্স এআই মডেলগুলি প্রোপ্রাইটরি মডেলগুলিকে প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে চলেছে। কার কাছে বেশি উপকরণ ও সম্পদ (রিসোর্সেস্) রয়েছে— এআই সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সেটি এখন আর বিচার্য বিষয় নয়। ওপেন সোর্স সংবলিত এআই উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা এবং তার ফলাফল সমূহ কার্যকর করার ক্ষেত্রে কারা, কতটা এগিয়ে রয়েছে, বা ভবিষ্যতে কোন পথে উন্নততর এআই গবেষণা সম্ভব, সেই বিষয়গুলি আগামীদিনে এআই-এর প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে। অর্থনীতি এবং কর্পোরেট দুনিয়ার আধিপত্যের সীমানা ছাড়িয়ে ভূ- রাজনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রগুলিতে বর্তমানে এর প্রভাব বিস্তৃত।

বেজিংকে নিয়ন্ত্রণও জরুরি : বহু বছর ধরে উচ্চ- কার্যক্ষমতাসম্পন্ন অর্ধ-পরিবাহী (সেমিকন্ডাক্টর) পদার্থ সমূহ রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ জারির মাধ্যমে এআই দুনিয়ার শীর্ষস্থান দখলের চীনা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চীনকে Nvidia-র A100 ও H100 এআই-চিপ বিক্রির পর কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমেরিকার জো বাইডেন প্রশাসন। আমেরিকার ধারণা ছিল যে, অত্যাধুনিক হার্ডওয়্যার প্রাপ্তির সুযোগটা কম থাকলে, এআই ক্ষেত্রে চীনের বিকাশ ধীরগতিতে হবে। এই ধারণাটিকে অবশেষে ভুল প্রমাণ করল ডিপসিক। ডিপসিক প্রমাণ করল যে, এআই যদি আরও দক্ষতা জারিত হয়ে উঠতে পারে, তবে হার্ডওয়্যারের দুষ্প্রাপ্যতা এআই গবেষণায় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে অক্ষম। সবরকম সীমাবদ্ধতাকে জয় করে আত্মপ্রকাশ করা ডিপসিক— চীনের কোনো একক কৃতিত্ব নয়। এআই প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নে এটি একটি মৌলিক পরিবর্তনের উদাহরণস্বরূপ। এআই ক্ষেত্রে আমেরিকার শীর্ষস্থান হারানোর ইঙ্গিত দেয় না ডিপসিক। এআই বিকাশের ক্ষেত্রটির বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিকে তুলে ধরে ডিপসিক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এই বৃহত্তর পরিবর্তন ইঙ্গিত দেয় যে, সবচেয়ে বড়ো কর্পোরেট ল্যাবের মালিক বা সবচেয়ে বেশি কম্পিউটিং রিসোর্সের অধিকারীর উপর এআই ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে না। এআই-এর দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহী, এই সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণে ইচ্ছুক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় আগ্রহীরাই আগামীদিনে হতে চলেছে এআই ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক। ডিপসিকের প্রতি সিলিকন ভ্যালির প্রতিক্রিয়াও স্পষ্ট। এটি আমেরিকার প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব হারানোর বিষয় নয়; এআই- বিষয়ক ন্যারেটিভের উপর মার্কিন আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ডিপসিক কোনো অন্তিম বিন্দু নয়। ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে পারে তার একটি পূর্বাভাস মাত্র। কর্পোরেট মালিকানাধীন ক্লোজড্ এআই মডেলগুলি হলো এমন এক-একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবস্থা, যার অন্তর্নিহিত কোড, ট্রেনিং ডেটা এবং অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের যাবতীয় প্রক্রিয়া থাকে সম্পূর্ণ গোপন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপসিক- বিদ্বেষের কারণ এআই ক্ষেত্রে চীনা প্রভাব বৃদ্ধি নয়। কর্পোরেট মালিকানাধীন এআই জগতের প্রভাব হ্রাস হলো মার্কিনি উষ্মার কারণ। ভূ -রাজনৈতিক এআই একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে, কর্পোরেট মালিকানাধীন ক্লোজড্ মডেলগুলিকে টপকে মুক্ত গবেষণা সমূহ— আগামীদিনে ওপেন সোর্স বিশিষ্ট এআই মডেল উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে নিশ্চিতভাবে ত্বরান্বিত করবে।

(লেখক রিসার্চ অ্যাট সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড হোলিস্টিক স্টাডিজের নির্দেশক)

মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের হামলার শিকার হিন্দুরা

রাজ্যের বৃহত্তম মুসলমান অধ্যুষিত জেলা মুর্শিদাবাদে ফের হিন্দুদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠলো। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের পতিকাবাড়ি বাজারের ঘটনার কথা উল্লেখ করে গত ১০ মার্চ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখেন, 'হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর করা হচ্ছে, হিন্দুদের সম্পত্তিও ধ্বংস করা হচ্ছে।' ওই পোস্টেই তিনি রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের কাছে হিন্দুদের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান। যদি পুলিশ-প্রশাসন নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে তিনি রাজ্যপালকে বিএসএফ মোতায়েন করারও অনুরোধ জানান।

ওইদিন এবং তার পরের দিন বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত (কাঞ্চন) মৈত্রকে পাশে নিয়ে নওদার ঘটনায় রাজ্য সরকারের পুলিশ দপ্তরের দিকে আঙুল তোলেন তিনি। অন্যদিকে গত ৯ মার্চ গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে অমিত মালব্য লিখেছেন, 'বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরমপন্থী সমর্থকরা মুর্শিদাবাদের নওদার পাতিকাবাড়িতে হিন্দুদের দোকান ও সম্পত্তি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত ৪৮ ঘণ্টায় হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুরের বেশ কয়েকটি খবর এসেছে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় এহেন পোস্ট করে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যও দাবি করেছেন, গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদের নওদায় হিন্দুদের ধর্মস্থান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে লাগাতার হামলা চালাচ্ছে মুসলমানেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও রাজ্যের বিরোধী দলনেতার মতোই তুলেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে অমিত মালব্যর ট্যুইট : 'পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানানো উচিত।' মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজেপির রাঢ়বঙ্গের সহ-আহ্বায়ক দেবতনু ভট্টাচার্যও। তিনি বলেন, 'মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। সেখানে পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উৎখাত করা না গেলে হিন্দু বাঙ্গালির ফের উদ্বাস্তু হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।'

মূলধারার মিডিয়া এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবরটি ব্ল্যাকআউট করায় রাজ্যের মানুষ কোন বারুদের স্তূপের ওপর আছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী তা জানতেও পারছেন না। উলুবেড়িয়ায় ঠিক একই কারণে হিন্দুদের ওপর হামলা হয়েছে, কাশ্মীরে আজাদির দাবিতেও পোস্টার পড়েছে। নওদায় হিন্দুদের ওপর হামলা হলো কীসের ভিত্তিতে তা জানার কোনো উপায় নেই।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার ঘটনার ঘা এখনও দগদগে হয়ে রয়েছে। এর আগে গত বছরেই রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর। সেই সময় শক্তিপুর হাইস্কুল মোড়ের কাছে রামনবমীর শোভাযাত্রা যখন একটি মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখনই মুসলমান দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে দাবি করা হয়েছিল। সেই সংঘর্ষের জেরে দুই নাবালক, একাধিক পুলিশকর্মী-সহ মোট আঠারো জন জখম হয়েছিলেন। জখম ব্যক্তিদের অনেকেরই হাতে এবং পায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল বলে জানা গিয়েছিল। জখমদের মধ্যে ছিলেন শক্তিপুর থানার তৎকালীন আইসি। পরে শক্তিপুর ও বেলডাঙার দুই ওসি'কে দায়িত্ব থেকে সরিয়েও দেয় নির্বাচন কমিশন।

যাইহোক, বর্তমান প্রশাসনের জমানায় রাজ্যের সীমান্তে মুসলমান অধ্যুষিত এক জেলায় যেভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হচ্ছেন হিন্দুরা তা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিক দিয়েও যথেষ্ট উদ্বেগের বলে মনে করেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। বিশেষ করে এমন একটা সময় এই ঘটনা ঘটলো যেদিন দেশবাসী ক্রিকেটে ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের আনন্দে মত্ত। মূলধারার মিডিয়া এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবরটি ব্ল্যাকআউট করায় রাজ্যের মানুষ কোন বারুদের স্তূপের ওপর আছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী তা জানতেও পারছেন না। উলুবেড়িয়ায় ঠিক একই কারণে হিন্দুদের ওপর হামলা হয়েছে, কাশ্মীরে আজাদির দাবিতেও পোস্টার পড়েছে। নওদায় হিন্দুদের ওপর হামলা হলো কীসের ভিত্তিতে তা জানার কোনো উপায় নেই। রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই মুর্শিদাবাদকেও মুসলমান দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার ঘৃণ্য চক্রান্ত চলেছে। সুতরাং সময় থাকতে সাধু সাবধান!

প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভমেলায় কে কী পেলেন?

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

১৯৮২ সালে সমরেশ বসুর উপন্যাস নিয়ে একটি ছায়াছবি তৈরি হয়েছিল 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'। আজ প্রায় ৪০ বছর পর প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ শেষে কে কী পেল তার সন্ধানে নেমেছে রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতির কারবারিরা।

স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৪৪ বছর পর আয়োজিত এই পূর্ণমহাকুম্ভ অনেক দিক থেকেই ছিল অভাবনীয়। প্রথমত, ভারতে মুসলমান শাসনে আকবরের সময় হতে এদেশে যতবার কুম্ভমেলা হয়েছে সবগুলিই অনুষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহবাদে। কিন্তু এবারের মহাকুম্ভ যোগী আদিত্যনাথের শাসনকালে আকবরের দেওয়া নাম আল্লাহবাদে নয়, ভারতের প্রয়াগরাজেই সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এবার প্রথম বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠল এই মহাকুম্ভমেলা, যেখানে প্রায় সাড়ে ৬৫ কোটি ভক্তের সমাগম হলো। যা ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি। প্রায় ১৮০০০ ট্রেন, তিন হাজার বিমান, ৪০০০ হেক্টর জুড়ে আবাস ব্যবস্থা, ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ স্নানের ঘাট, ৫০ হাজার নিরাপত্তারক্ষী, ১৫ হাজার সাফাইকর্মী, সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকার লেন-দেন— সব বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে এক মহাকুম্ভমেলা।

কিন্তু সনাতনের এই একতা, ভব্যতা, এই সৌন্দর্য সহ্য হয়নি এদেশের সনাতন বিরোধী কংগ্রেস, সিপিএম, আরজেডি, সমাজবাদী আর তৃণমূলের। মহাকুম্ভমেলা শুরুর কয়েক দিন পর থেকেই শুরু করেছিল ছিদ্রান্বেষণের কাজ। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কুম্ভমেলা উপলক্ষে বিরাট প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কোটি কোটি মানুষের জনসমাগম, ব্যবস্থাপনার কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। লখিন্দরের তৈরি লোহার বাসরেও সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র ছিল। কিন্তু নির্বাচনী যুদ্ধে হারতে হারতে ক্ষতবিক্ষত।

বাঘ গুলি খাওয়ার পর যেমন প্রতিশোধ স্পৃহায় হিংস্র হয়ে ওঠে, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতা বিকাশ ভট্টাচার্যও মহাকুম্ভের এক কোণে কয়েক মিনিটের একটি ছোট্ট অগ্নিকাণ্ডকে সামনে রেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুম্ভমেলা নিয়ে ন্যাক্কারজনক মন্তব্য লিখলেন— 'মহাকুম্ভে মহা অগ্নিকাণ্ড। এর জন্য কি মহাপাতকেরা দায়ী? যে জলে ডুব দিলে সব পাপ মুছে যায়, তেমন একটা মহাপুণ্যস্থানে আগুন কী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবদান? হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে এরা একটি অন্ধসংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।' দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রশ্ন তুললেন, 'মহাকুম্ভে ডুব দিলে কী এদেশের গরিবি দূর হয়ে যাবে? দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে? অভুক্ত শিশুদের পেট ভরে যাবে? শ্রমিকের রোজগার বেড়ে যাবে? হাজার হাজার টাকা খরচ করে যেভাবে গঙ্গায় ডুব মারার কম্পিটিশন চলছে তাতে কি দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে?' আরজেডির লালু প্রসাদ যাদব তো মহাকুম্ভকে 'ফালতু'ই বলে দিলেন। উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব আবার মহাকুম্ভকে নিয়ে অভিযোগের বন্যা বইয়ে দিলেন। বললেন--- 'কুম্ভের জল ব্যাকটিরিয়ায় পরিপূর্ণ, স্নানের অযোগ্য, এখানে কারোর স্নান করা উচিত নয়।' আর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কুম্ভমেলায় একটি পদপিষ্টের ঘটনায় কয়েকজন পুণ্যার্থীর দুঃখজনক মৃত্যুকে সামনে রেখে হিন্দুর শ্রদ্ধার এই মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে আখ্যায়িত করলেন।

নিন্দুকেরা বলেন তৃণমূল দলটা নাকি পাপে পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই পতাকা নিয়ে ডুব লাগিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে এলেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর বারণকে অবজ্ঞা করে যে লক্ষ বাঙ্গালি মহাকুম্ভে ডুব লাগিয়েছেন তারা নাকি তৃণমূলকে সমর্থন করার পাপ ধুয়ে মুছে এলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কুম্ভমেলায় দুর্ঘটনা কি এবারেই প্রথম? ইতিহাস বলে, স্বাধীনতার পরে ১৯৫৪ সালে জওহরলালের জমানায় কুম্ভমেলায় চারশোরও বেশি পুণ্যার্থী মারা গিয়েছিলেন। এই সেদিন ২০১৩ সালে অখিলেশ যাদবের শাসনে আয়োজিত কুম্ভমেলায় ৩৬ জন পুণ্যার্থী প্রাণ হারান। সেদিন তো মুখ্যমন্ত্রী একবারের জন্যও কুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলেননি। অথবা বিকাশবাবুরা কুম্ভস্নানের অসারতা নিয়ে ভাষণ দেননি, লালুবাবুরা বেঁচেই ছিলেন, কুম্ভকে ফালতু বলে দাগিয়ে দেননি, অথবা তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া মাইনো— কুম্ভ স্নানে গেলে গরিবের পেটে অন্ন জুটবে কিনা সে প্রশ্নও তোলেননি। প্রতি বছরই তো মক্কায় হজে গিয়ে কয়েকশো মুসলমান পুণ্যার্থীর মৃত্যু ঘটে। তাকে কিন্তু কেউ তো তাকে 'মৃত্যুপুরী', 'ফালতু' বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে না। শয়তানকে পাথর ছুঁড়তে গিয়ে পুণ্যার্থীদের জখম হওয়াকে কেউ কুসংস্কার বলে না। জমজমের জলকে দূষিত ব্যাকটিরিয়াযুক্ত বলার কেউ সাহস করে না। তবে কেবল হিন্দুর আস্থাকে এরা তাচ্ছিল্য করে কেন?

আসলে এদের গাত্রদাহের কারণ অন্য। এরা প্রত্যেকেই বিভেদের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। হিন্দুসমাজকে জাতপাতে ভেঙে তার

সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটের দৌলতে ভোটযুদ্ধে জিততে চান। কিন্তু মহামিলনের এই মহাকুম্ভে আসা ৬৬ কোটি হিন্দু কেউ কাউকে তার জাত জিজ্ঞেস করেনি, কে কোন রাজ্য থেকে এসেছে, কার কোন ভাষা, কার কোন পোশাক, কার কোন খাদ্যাভ্যাস, একবারের জন্যও কেউ জানতে চায়নি। সকলে সনাতনী হিসেবে আস্থার ডুব দিয়েছে। কুড়ি কিলোমিটার ব্যাপী দীর্ঘ স্নানঘাট কোথাও কোনো একটি জাতি- সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ যতটা ছিল ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের, ঠিক ততটাই ছিল যাদব, জাঠ, দলিতদের। কোটি কোটি হিন্দু যেভাবে এক হয়ে কুম্ভে ডুব দিয়েছে তাতে যে এদের সমূহ বিপদ। হিন্দুকে যদি জাতপাত না ভাঙতে পারা যায় তবে এরা ক্ষমতায় ফিরবে কী করে? তাই এই মহাকুম্ভে উত্থিত অমৃতকে গরল বলে মিথ্যা প্রচার করে চলেছে।

কিন্তু এত কুৎসা করেও হিন্দুর জনজাগরণ ঠেকানো গেল না। দিন যত গড়িয়েছে হিন্দু বিদ্বেষী এই দলগুলিকে নিজের ফেলা থুতু চেটে খেতে হয়েছে। তৃণমূল ধীরে ধীরে বুঝছে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটের চক্করে পড়ে ৭০ শতাংশ যদি হাতের বাইরে চলে যায় তবে তাদের টিকে থাকা দুষ্কর। তাই রচনা ব্যানার্জি, সুজাতা খাঁ, কাঞ্চন মল্লিক, শান্তনু সেনরা ছুটে গিয়েছেন কুম্ভে। ঘাসফুল আঁকা পতাকা দু'হাতে তুলে ডুবকি লাগিয়েছেন, ভরপেটা নোনা জল খেয়ে পেট ফুলিয়েছেন, দেঁতো হাসি হেসে ছবি তুলেছেন, তারপর সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন। গলার শিরা ফুলিয়ে বলেছেন— 'আমরা সনাতনী'। এসব দেখে আমার প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর মতে এই কুম্ভ যদি মৃত্যুকুম্ভই হয় তবে রচনা-সুজাতা-কাঞ্চনরা কুম্ভে ডুব লাগিয়ে বেঁচে ফিরল কী করে? তবে কি নেত্রী ভুল বলেছিলেন নাকি এই নেতারা নেত্রীকে খিল্লি করতেই কুম্ভে গিয়েছিলেন? নিন্দুকেরা বলেন তৃণমূল দলটা নাকি পাপে পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই পতাকা নিয়ে ডুব লাগিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে এলেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর বারণকে অবজ্ঞা করে যে লক্ষ বাঙ্গালি মহাকুম্ভে ডুব লাগিয়েছেন তারা নাকি তৃণমূলকে সমর্থন করার পাপ ধুয়ে মুছে এলেন।

এতো গেল শাসকের কথা। বামপন্থীরাও কম মাদারি কা খেল দেখাচ্ছে না মহাকুম্ভর এমনই সাইড এফেক্ট যে সিপিএম একসময় শ্রীরামকৃষ্ণকে মৃগী রোগী বলে কুৎসিত মন্তব্য করত তারাই এখন তাদের রাজ্য সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি লাগিয়ে পাপক্ষয় করছে। অখিলেশ যাদব অবশ্য ডিগবাজি খাওয়ার চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়ন্স। সঙ্গমের জলে ব্যাকটেরিয়া ভর্তি বলে অভিযোগ তুলে সুবিধে করতে না পেরে শেষে সটান চলে গেলেন ডুব লাগাতে। তারপর দাঁত কপাটি লেগে যাওয়া ঠাণ্ডায় গুনে গুনে ১১টি ডুব।

মহাভারতে একটি গল্প আছে। বনের মধ্যে দ্রোণাচার্য অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। শিক্ষার্থী পঞ্চপাণ্ডব। তাদের সঙ্গে ছিল একটি পোষা কুকুর। কুকুরটি হঠাৎ ভৌ ভৌ শব্দে বনের গভীরে দৌড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর যখন ফিরে এল সকলে দেখে কুকুরটির মুখে কোনো আঘাত বা রক্তপাতের চিহ্নে নেই, কিন্তু তার মুখে পাঁচটি তির আটকে মুখটি সেলাই হয়ে গিয়েছে। তির এমন ভাবে বিদ্ধ যে কুকুরটির একবিন্দু চিৎকার করার সাধ্য নেই। পরে জানা গেল সেই অদ্ভুত তির নিক্ষেপকারী যুবকটি ছিল একলব্য। সে ছিল দ্বাপর যুগের কাহিনি। কিন্তু আজ কলি। এ যুগের আর এক একলব্য যোগী আদিত্যনাথ মহাকুম্ভ শেষে এমন এক তির নিক্ষেপ করেছেন যার আঘাতে এদেশের ইন্ডিজোট নামক হাঁসজারুটির হাঁক-ডাক বন্ধ। তাঁর ছোঁড়া বাণ মমতা- বিকাশ-অখিলেশ-রাহুল আর তেজস্বী--- এই পঞ্চ নেতার ধানাই পানাই বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'পবিত্র মহাকুম্ভ কাউকে খালি হাতে ফেরায়নি। যে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। শকুনের দল মৃতদেহ পেয়েছে, শুয়োরেরা আবর্জনা পেয়েছে, আস্থাবানেরা পুণ্য পেয়েছে,গরিবরা রোজগার পেয়েছে, ধনবানরা ব্যবসা পেয়েছে, শ্রদ্ধাবানরা পরিচ্ছন্নতা পেয়েছে, পর্যটকরা অব্যবস্থা পেয়েছে, সদ্ভাবনাপরায়ন ব্যক্তি জাতপাতহীন ব্যবস্থা পেয়েছে, আর ভক্ত ভগবানকে পেয়েছে। অর্থাৎ সকলেই নিজের নিজের স্বভাব চরিত্র অনুসারে মহাকুম্ভে কিছু না কিছু লাভ করেছেন।'

কোরান বলে পৃথিবী চ্যাপ্টা, চন্দ্র স্থির। বাইবেল বলে পৃথিবী স্থির আর সূর্য তার চারিদিকে ঘুরছে। এই তত্ত্বকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর জুটেছিল ফাঁসির সাজা। পৃথিবীর বহু দেশ সূর্য বা চন্দ্র দেখে তাদের উৎসব পালন করে। কিন্তু ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা বলে বৃহস্পতি গ্রহ ১২ বছরে একবার পুনরায় নিজের রাশিতে ফিরে আসে, ঠিক তখনই হয় পূর্ণকুম্ভ। আর ১৪৪ বছর অন্তর চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী আর বৃহস্পতি যখন এক সরলরেখায় অবস্থান করে তখন হয় মহাকুম্ভ। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক বিশ্বে মহাকাশ গবেষণার আয়ু মাত্র ২০০ বছরের। তাই কুম্ভ কেবল আধ্যাত্মিকতার প্রতীকই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতীকও বটে। অথচ এতবড়ো বিজ্ঞানের মহোৎসবকে এরা ছোটো করেছে?

এদেশের মুসলমান ভোটভিখারি দলগুলি সেকুলারিজমের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেছে। এখানে সেকুলারিজমের অর্থ--- একজন মুসলমান মজহবি মুসলমান হতে পারবে, একজন খ্রিস্টান রিলিজিয়াস খ্রিস্টান হতে পারবে, কিন্তু একজন হিন্দু কোনোমতেই নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে পারবে না। তাকে সেকুলার হিসেবেই পরিচয় দিতে হবে। এতদিন ধরে চলে আসা এই ভ্রম ২০২৫-এর মহাকুম্ভ ভেঙে দিয়েছে। হিন্দু এখানে 'হিন্দু' পরিচয় নিয়ে বৃহত্তম সনাতন পরিবারের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে। তাতেই এদের এত ক্ষোভ।

এই কুম্ভমেলায় কেউ খুঁজলেন মৃতদেহ, কেউ খুঁজলেন আবর্জনা, কেউ খুঁজলেন ব্যাকটিরিয়া, আবার কেউ-বা খুঁজলেন অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু যারা এতবড়ো মহাকুম্ভের আয়োজন করলেন সেই যোগীজী ও মোদীজী কী কিছুই পেলেন না? নাকি কুম্ভ তাঁদের খালি হাতে ঘরে ফেরালো? না, তারা মোটেই খালি হাতে ফেরেননি। মহাকুম্ভের এই জনপ্লাবনে তাঁরা অনেক কিছুই খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা পেয়েছেন হিন্দু একতা, রাষ্ট্রীয় একাত্মতা, আর জাতির নবজাগরণ। এই মহাকুম্ভে যোগীজী 'বাঁটোগে তো কাটোগে, এক রহগে তো সেফ রহগে' মহামন্ত্রের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। হিন্দু জাতপাত ভুলে এক হয়েছে। বিগত দিনে মহারাষ্ট্র-দিল্লি তার প্রমাণ দিয়েছে। আগামীতে বিহার-পশ্চিমবঙ্গও তার প্রমাণ রাখবে। □

মহাকুম্ভকে অসম্মান করে নিজেদের স্বরূপ উন্মোচন করেছে রাষ্ট্রবিরোধীরা

মণীন্দ্রনাথ সাহা

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভমেলা শেষ হলো। ১৪৪ বছর পর গত ১৩ জানুয়ারি শুরু হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হলো মহাকুম্ভলো। এই ৪৫ দিনে প্রায় ৬৬ কোটি মানুষ মহাকুম্ভে মহাস্নান করেছেন। চারবার তাঁবুতে আগুন লেগেছে। মৌনী অমাবস্যায় ঠেলাঠেলিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর মতো দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছে, যা কেউ আশা করেনি। তবুও গোটা বিশ্বের মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে মহাকুম্ভমেলা।

মহাকুম্ভমেলা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজন করার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন সরকারের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু বিরোধীরা কুম্ভমেলার সমালোচনা করেছে, তাদের 'না জানা বংশ পরিচয়' প্রকাশ্যে এনেছে। শিবের ডমরু বেজেছে, ঢাক-ঢোল-শঙ্খনাদ হয়েছে। ভারতে তো বটেই গোটা বিশ্বে হিন্দুত্বের ডঙ্কা বেজেছে। রাজনীতিবিদরা আজও জোর গলায় তর্ক-বিতর্ক করে যাচ্ছেন। তা নিয়ে একটু আলোকপাত করা যাক—

কুম্ভমেলায় একটি ছোট্ট অগ্নিকাণ্ডের পর এরাজ্যের মহাজ্ঞানী সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন, 'কুম্ভমেলায় মহা অগ্নিকাণ্ড। এর জন্য কি মহাপাতকেরা দায়ী? যে জলে ডুব দিলে সব পাপ মুছে যায়, তেমন একটা মহাপুণ্যস্থানে আগুন কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবদান? হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে যারা অন্ধ সংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তারা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাবলে অগ্নিদেবকে শান্ত রাখতে পারলেন না কেন?'

মহাকুম্ভকে অন্ধকুপ্রথা বলে দেগে দেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন বিকাশবাবু। তার জন্য তিনি কমরেডদের কাছ থেকে হাততালিও পেয়েছেন। বিকাশবাবু হিন্দু দেব-দেবীদের ক্ষমতাহীনতা নিয়ে জ্ঞান দিয়ে প্রকারান্তরে তাঁদের অতীত দিনের পাপকর্মের বার্তাটা দিলেন না তো? অনেকেই বলছেন, বিকাশবাবুদের দলের লোকেরা একসময় ছেলেকে হত্যা করে তার রক্ত দিয়ে ভাত মেখে মা-কে খাইয়েছেন কিংবা হাজার হাজার উদ্বাস্তু হিন্দুশরণার্থীদের এরাজ্যে ডেকে এনে হত্যা করেছেন অথবা দিনের বেলা প্রকাশ্য রাজপথে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে প্রমাণ করেছেন হিন্দু দেব-দেবীদের সত্যিই কোনো ক্ষমতাই নেই। থাকলে বিকাশবাবুরা শাস্তি পেতেন। উপরন্তু কংগ্রেসের ইন্দিরা গান্ধীকে যাঁরা ডাইনি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছিলেন সেই ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূর

চরণ সেবায় তাঁরা আজ মগ্ন। জানি না, তাঁদের এই পরিণতির পেছনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো অবদান আছে কী না!

শুধু বিকাশবাবু নন, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রশ্ন করেছেন, 'মহাকুম্ভে গঙ্গায় ডুব দিলে কী এদেশের গরিবি দূর হয়ে যাবে? দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে? অভুক্ত শিশুদের পেট ভরে যাবে? শ্রমিকের রোজগার বেড়ে যাবে? হাজার হাজার টাকা খরচ করে সেভাবে গঙ্গায় ডুব মারার কম্পিটিশান চলছে তাতে কী দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে?' ভাবুন একবার। হিন্দুদের ভোটে জিতে হিন্দুধর্মকে কতটা ঘৃণা করলে এরকম প্রশ্ন করা যায়!

মহাজ্ঞানী খাড়গে হয়তো জানেন না যে, যতটুকু জানা গিয়েছে তাতে মহাকুণ্ডে সেখানে ৪৫ কোটি পুণ্যার্থীর আগমন আশা করা হয়েছিল সেখানে ৬৬ কোটির বেশি পুণ্যার্থীর আগমন ঘটেছে। এই মহাকুম্ভ শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। এই ব্যবসার সিংহভাগ গিয়েছে গরিব শ্রমিকদের হাতে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা বলেছে, এই বছর কেবল কুম্ভমেলার কারণে ভারতের জিডিপি ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। মহাকুম্ভের কারণে এই বছর ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের ভিসা ৯১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এসব কী দেশের আর্থিক উন্নতি নয়?

দেশবাসী খাড়গের কাছে আরও জানতে চায়— কংগ্রেসের পূর্বতন মহাপণ্ডিতরা ভারত থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার পুণ্যার্থীকে জন প্রতি সরকারি কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মক্কায় হজ করতে পাঠাতেন। তার ফলে ভারতের আর্থিক উন্নতি কতটা হয়েছিল বা কতজনের দারিদ্র্য দূর হয়েছে?

শুধু খাড়গেরা নন, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহাকুম্ভের জনজোয়ার দেখে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছেন যে, তিনি মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে ভারতের কোটি কোটি হিন্দু আঘাত করতে দ্বিধা করেননি। অথচ তাঁর দলেরই সাংসদ-সহ অনেকেই মহাকুম্ভ তথা তাঁর মতে 'মৃত্যুকুম্ভে' গিয়ে দলের পতাকা গায়ে জড়িয়ে স্নান করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহাকুম্ভের জনজোয়ার দেখে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছেন যে, তিনি মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে ভারতের কোটি কোটি হিন্দু আঘাত করতে দ্বিধা করেননি। অথচ তাঁর দলেরই সাংসদ-সহ অনেকেই মহাকুম্ভ তথা তাঁর মতে 'মৃত্যুকুম্ভে' গিয়ে দলের পতাকা গায়ে জড়িয়ে স্নান করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন।

মহাকুম্ভ নিয়ে কংগ্রেস-সহ ইন্ডি জোটের শরিকরা 'গুজব' ছড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন দেশের সাধুসন্ত সমাজ। তাঁরা ওই নেতাদের সতর্ক করে বলেছেন, 'আপনাদের আমরা চিনি, দয়া করে গুজব ছড়াবেন না।' বিরোধীদের আচরণে ক্ষুব্ধ পঞ্চ নির্মোহী আখড়ার জগদ্‌গুরু মহামণ্ডলেশ্বর সন্তোষ দাস (সাতুয়া বাবা) মহারাজ বলেছেন, 'যাঁরা সন্ত এবং মহাকুম্ভ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সপা প্রধান অখিলেশ যাদবজী, আপনি কখনো সনাতন ধর্ম অনুসরণ করেননি... আপনাদের শাসন আমলে উত্তরপ্রদেশে হিন্দুদের কীভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।' '...রাজনৈতিক লাভের জন্য গুজব ছড়ানো বন্ধ করুন। আমরা সনাতনী এবং আপনাদের মতো নেতাদের অন্যদের বিভ্রান্ত করার অনুমতি দেব না।'

যারা যারা মহাকুম্ভ নিয়ে অপপ্রচার করেছেন, তাদের উদ্দেশে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বাজেট অধিবেশনে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— '...এই মহাকুম্ভে শকুনেরা লাশ খুঁজে পেয়েছে, শূকরেরা ময়লা খুঁজে পেয়েছে। পুণ্যার্থীরা পুণ্য খুঁজে পেয়েছেন, গরিবরা কাজ পেয়েছে, ব্যবসায়ীরা লাভ পেয়েছে, পর্যটকরা আনন্দ খুঁজে পেয়েছে' ইত্যাদি। তাঁর এই ভাষণ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মুহূর্তের মধ্যে।

আসল কথা, মহাকুম্ভের জনজোয়ার দেখে হিন্দু বিরোধীরা ভীষণ ভয় পেয়েছেন। কেননা এরা দেশের হিন্দুদের ভুল বুঝিয়ে হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করার পথে নেমেছে। কিন্তু বর্তমানে সেই অসার নির্বোধ হিন্দুদের মধ্যে জাগরণের স্পৃহা দেখা দেওয়ায় এককালের পরস্পর পরস্পরের শত্রু কংগ্রেস কমিউনিস্ট, তৃণমূলিরা ভীত-আতঙ্কিত। তাই তাঁরা জোট বেঁধে মহাকুম্ভ নিয়ে অপপ্রচারে নেমেছে।

এবারের মহাকুম্ভ একাধিক রেকর্ড ভাঙা-গড়ার সাফল্যের জন্য শিরোনামে এসেছে। একদিকে ৬৬ কোটির বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নান করেছেন, যা নিজেই একটি বিশ্বরেকর্ড। অন্যদিকে ২৪ ফেব্রুয়ারি মহাকুম্ভ মেলার ৪টি জোনে ১৫ হাজার সাফাইকর্মী একযোগে পরিষ্কার অভিযানে অংশগ্রহণ করে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড-এ রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এই ১৫ হাজার কর্মী ৪৫ দিন ধরে কোটি কোটি ভক্তের পুণ্যার্জনের পবিত্র মহাকুম্ভস্থান নিঃশব্দে পরিচ্ছন্ন করে গেছেন। কেউ এঁদের খবর রাখে না, খবর করে না। মহাকুম্ভের মহাযুদ্ধের মহাযোদ্ধা এরাই। এরাই শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। মহাকুম্ভমেলায় অক্লান্ত ভাবে শ্রমদান করা সাফাইকর্মীদের গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সম্মাননা জ্ঞাপন করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

আজ এই পৃথিবীতে যারা জীবিত আছি, তারা কেউ আর মহাকুম্ভ দেখবো না। তাই দূর থেকেই দেখি মহাকুম্ভে মানুষের মহামিলন। এই মহামিলন সুন্দরতর হোক, ঋষিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সম্পৃক্ত হোক ভারতবাসী, মানুষের সমাজ জীবনে মহাকুম্ভের জ্ঞান-প্রজ্ঞানের আলোকবর্তিকা সম্প্রসারিত হোক, আধ্যাত্মিকতার দিশারী হোক, মানুষ জ্ঞানসুধা পান করুক এই প্রার্থনা করি। □

সংবিধান কাজ করবে না হুমায়ুন, হাকিমদের মতো নেতাদের স্বপ্ন সফল হলে, এখন যেমন বাংলাদেশে চলছে।

বাঙ্গালি হিন্দুদের খতম করার ডাক রাজ্যের জেহাদি নেতৃত্বের

রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

মহাকুম্ভ না মৃত্যুকুম্ভ। তবে যে যাই বলুক, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্ববন্দিত অনাদি অনন্তকালের তথা শত সহস্র বছরের শ্রদ্ধা ও সনাতনী ভাবাবেগ, এক অনাবিল বিশুদ্ধতার বিশ্বাস। যা কোনো ভাবেই খাটো করে দেখার মতো নয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এহেন সনাতনী ভাবাবগকে কেন এভাবে একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করলেন, সেটাই বড়ো আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এই সতর্কবাণীর পরেও তিনি তাঁর সবচেয়ে কাছের নেতা-নেত্রীদের সেই মৃত্যুকুম্ভে যাওয়া আটকাতে পারলেন না।

রচনা, কাঞ্চন, সুজাতা, দেবাশিস, এমনকী এ সময়কালের দল বিরোধী মন্তব্যের সবচেয়ে চর্চিত নেতা শান্তনু সেন পর্যন্ত মহাপুণ্যের আশায় লুকিয়ে ডুব দিয়ে এলেন সেই মহাকুম্ভে। বড়ো মায়া লাগে এহেন হিন্দু তৃণমূলি বেচারাদের! পদ হারানোর ভয়ে তাদের লুকিয়ে কুম্ভস্নান করতে হয়। আবার পশ্চিমবঙ্গে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি একটু একটু করে তাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করছে, মানুষের সামনে শাসক শ্রেণীর ধারাবাহিক দুর্নীতিকে তুলে ধরছে, ঠিক সেই সময় আবার বিরোধী দলনেতাকে বলা হচ্ছে সংখ্যালঘুরা রাস্তায় নামলে তিনি পারবেন তো সামাল দিতে। বিরোধী দলনেতার অপরাধ? তিনি রাজ্যে সম্প্রতি দুর্গা প্রতিমার মূর্তি ভাঙা থেকে আরম্ভ করে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা করতে না দেওয়া-সহ ধারাবাহিক ঘটে যাওয়া হিন্দু সংস্কৃতির মর্যাদা হানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

সম্প্রতি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে বলতে শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তারা তেত্রিশ আর ভারতে সতেরো শতাংশ। সংখ্যালঘুরা দ্রুত একদিন যেভাবেই হোক সংখ্যাগুরু হবে। একজন রাজনৈতিক নেতা তথা মন্ত্রীর মুখে কী মারাত্মক জেহাদি উসকানি, সাম্প্রদায়িক বিভাজন! এর আগেও একটি মজহবি অনুষ্ঠানে বলতে শোনা গিয়েছিল— 'তারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে ইমান নিয়ে আসতে হবে এবং এই কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে, খুশি হবেন আল্লাতালা'— না, ইনি কোনো ধর্মগুরু নন, উনি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা বর্তমান কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা শাসক সুপ্রিমোর সবচাইতে কাছের লোক তথা জনগণের প্রতিনিধি। ভাবুন, কার হাতে কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব? একদম সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত ব্লুপ্রিন্ট। এটা মাঝে মধ্যেই উনি ঝালিয়ে নেন, কখনো 'মিনি পাকিস্তান' করে দেবার কথা বলেন, কখনো অর্ধেক বাঙ্গালি একদিন উর্দু ভাষায় কথা বললেন এই স্বপ্ন দেখান আর এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করতে চাইছেন।

আবার তাঁর দলের চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান ইসলামি দেশগুলির বিচার বিভাগীয় যে আইনের উপমা দিলেন কিংবা গত লোকসভা ভোট চলাকালীন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির তিরিশ শতাংশ হিন্দুকে দু' ঘণ্টার মধ্যে কেটে ভাগীরথীর জলে ফেলে দেবার হুংকার দিলেন, কিংবা কিছুদিন আগে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সিদ্দিকুল্লা বললেন, হাম দো হামারা দো নয়, হামারা চার। রাজনীতির আঙিনা থেকে হিন্দুদের অসম্মান করে নিজেকে সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরু বানানোর নিদানের ক্ষেত্রে সিদ্দিকুল্লা, হুমায়ুন কবিরের দেখানো পথেই হাঁটছেন রাজ্যের হিন্দু বিদ্বেষী গুণধর একাধিক নেতা মন্ত্রী। আর আজও মেচেদা শান্তিপুর এক নম্বর অঞ্চলের প্রকাশ্য সমাবেশে বিরোধী দলনেতার ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে আফসার আলি নামক আরও এক জেহাদি তৃণমূলি হিন্দুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার

নিদান দিচ্ছেন। অথচ দলের পক্ষ থেকে এদের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতেও হয়নি। এরা কেউ কখনো গ্রেপ্তারও হবে না, কারণ এই শতাংশের ভোটেই রাজ্য সরকারের অস্তিত্ব টিকে থাকে। কিন্তু এহেন আক্রমণাত্মক নিদানের বিরুদ্ধে আর যাইহোক ভারতে হিন্দুদের পক্ষ থেকে কোনো হিংসাত্মক প্রতিবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে কোথাও এর প্রতিবাদে হিন্দুরা এককাট্টা হয়ে একটা টায়ারও জ্বালায়নি, একটা বাসও পোড়ায়নি, কোথাও রেললাইন উপড়ে ফেলে যাত্রীদের পাথর ছোঁড়া হয়নি, একটা দোকানঘরে কেউ অগ্নি সংযোগ ঘটায়নি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো পথ অবরোধ করে অসহায় যাত্রীদের হয়রানি করা হয়নি। অন্যদিকে হিংসাত্মক উসকানিমূলক মন্তব্য করা শাসকদলের পরিবারের লোকজন সুরক্ষিত আছেন। এত আঘাত, মূর্তি ভাঙা, দেব-দেবী নিয়ে কুকথা বলার পরেও হিন্দু অনেক বেশি সংযমের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন এখনো। এটাই তো হিন্দুদের উদারতা, কিন্তু এটাকে কোনোভাবেই দুর্বলতা ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না। মঞ্চে ঝাঁঝালো বক্তব্য রেখে হাততালি কুড়িয়ে নেত্রীর পছন্দের নেতা হতে যাবার আগে দেশের গৌরবময় ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি সর্বাগ্রে জানতে হবে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা নেত্রীকে। ভুলে গেলে চলবে না, হিন্দু একটা সহনশীল সাংস্কৃতিক জাতিগোষ্ঠী, যে জাতি প্রকৃতিদেবীকে পূজা করে, বৃক্ষ ও পশুপাখির পূজা করে, নারীজাতিকে মা বলে পূজা করে, এটাই হিন্দু ঐতিহ্য , সংস্কৃতি, আর এর জন্য হিন্দুরা উদার, ন্যায়পরায়ণ, আধ্যাত্মিক, যুক্তিবাদী, ভাগ্যবান ও গর্বিত।

এই হিন্দু জাতিটা এত ঠুনকো নয় যে ফিরহাদ, আফসার, হুমায়ুনদের মতো অশিক্ষিত লোকের কথায় হিংসাত্মক কার্যকলাপে মত্ত হবে। কিন্তু ঘটনাগুলো যদি উলটো হতো তাহলে কী হতো? আগামীদিনে হিন্দুর অস্তিত্ব কতটা সুরক্ষিত থাকবে এইরকম লোক প্রশাসনে থাকলে, সেটা হয়তো ভবিষ্যতই বলবে। বলে রাখা ভালো যে এগুলো কোনো প্রথম হুংকার নয়। তাঁরা নতুন কিছু বলেননি। সেদিন ছিল সুরাবর্দি, ওসমান, আর আজ ফিরহাদ, হুমায়ুন, আফসার প্রমুখের প্রকাশ্য জেহাদ। যে আশা সৈয়দ আহমেদের ছিল, ইকবালের ছিল, জিন্না এমনকী তথাকথিত বঙ্গবন্ধু বলে সমাদৃত মুজিবুর রহমানের মধ্যেও ছিল।

কারণ যে দলটায় তারা প্রাণভোমরা হয়ে আছেন, নিশ্চিতভাবে তাদেরও আপত্তি থাকার কথা নয়। আর করবেনই-বা কেন, পারতপক্ষে দল নিশ্চিতভাবে হয় এই কথাগুলোর মান্যতা দিয়েছে, নতুবা তাঁরা যারা হিন্দু তৃণমূলি নেতা তারা অন্তত ওর কথাটা মেনে নিয়েছেন, যে, তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষ, সন্ন্যাসী, সাধুসন্ত, ঋষি মহর্ষি, হিন্দু রাজা মহারাজা আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত জ্ঞানী গুণীজন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা, সাধক ব্যামাক্ষ্যাপা, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র আরও কত... এরা সবাই দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলেন। বছর বছর ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের এটাই সবচাইতে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন তৃণমূল দলের। আর যুগ যুগ ধরে সহনশীল হিন্দু সমাজ মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করে গেছে, আর অসহায়ভাবে আত্মাহুতি দিয়ে গেছে। আর ঠিক এভাবেই হারাতে হয়েছে আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ, কাশ্মীর প্রভৃতি ভূমিখণ্ড।

কিন্তু হিন্দুরা ভাবছেন এটা আবার হয় নাকি, ওরা পাগলের মতো বকছে, আমরা স্ত্রী পুত্র নিয়ে, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝুলিয়ে কাব্য চর্চা করতে করতে কী সুন্দর 'সেকুলারিজমের' রাজনীতি করছি, আমরা গান্ধীর অর্ধসত্য বাণী 'অহিংসা পরম ধর্ম' মেনে চলেছি, আমরা ধর্ম-ধর্ম করি না, জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। দু' একজন কেউ হয়তো ভুল করে বলে ফেলেছে, তাতেই নিন্দুকেরা গেল গেল রব তুলে ফেলেছে। এরকম কত কী ভাবছে সেকুলার হিন্দুরা তা জানি না। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি ভুলে গেছে নজরুলের প্রায় দু'শোটি গানে সুরারোপ করা চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের সেই অবিস্মরণীয় সংগীত সুরকার কমল দাশগুপ্তের কামালউদ্দিন হওয়ার করুণ ইতিহাস ও তাঁর শেষ পরিণতি। আবার পূর্ববঙ্গ থেকে ঘাড় ধাক্কা খাওয়া, ভিটেমাটি ছেড়ে এক কাপড়ে সম্পত্তি ফেলে আসা দাঁড়ে পোষা বুদ্ধিজীবী যারা ক্রীতদাসের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে শাসকের শেখানো নামতা পড়ে, 'ক্যা ক্যা, ছি! ছি! ওদের আবার খুবই গোঁসা। ওরা সিলেক্টিভ প্রতিবাদী, একটা সম্মান আছে কিনা! হিন্দু বিলুপ্ত হবে তো কী হয়েছে, আমরা মাসোহারা তো পাই!

সত্যিই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালি হিন্দুর দুর্ভাগ্য। ভাবতে অবাক লাগছে কলকাতা পুরসভার ওই মেয়রের চেয়ারে একদিন দেশবন্ধু বসতেন, সুভাষচন্দ্র বসতেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন বসতেন, আর আজ সেই চেয়ারে বিরাজমান এক চরম জেহাদি, কট্টর সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। যে কথায় কথায় মিনি পাকিস্তান বানায়, ধর্মান্তরণের নিদান দিয়ে সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরু হওয়ার ফরমান দেয়। আজ মমতা ব্যানার্জিকে এদের ঔদ্ধত্যের জন্য হিন্দু বলে সাফাই গাইতে হচ্ছে। আটশো বছরের গোলামি সহ্য করেও হিন্দু বাঙ্গালি জাতিটা থেকে বরাবরই ইতিহাস বিস্মৃত উদাসীন রয়ে গেল। বাঙ্গালি আজ বিস্মৃত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নি সংযোগের ইতিহাস, বিস্মৃত বৈদেশিক সুলতান, বাদশা ও নবাব কর্তৃক হাজার হাজার হিন্দু মঠ মন্দির ধ্বংসের ইতিহাস, বিস্মৃত শত সহস্র হিন্দু রমণীর তাদের লালসার শিকার হওয়ার ইতিহাস, বিস্মৃত লক্ষ হিন্দু নরনারীর বলপূর্বক ধর্মান্তরণের ইতিহাস।

হিন্দুরা আজ বিস্মৃত ১৯৪৬-এর নোয়াখালি কিংবা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। গোপাল মুখোপাধ্যায় বা নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের মতো লোককে তো নতুন প্রজন্মরা চেনে না। যদি ওই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে না দাঁড়াতেন গোটা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে হয়তো সেদিন হারাতে হতো। সংবিধান কাজ করবে না হুমায়ুন, হাকিমদের মতো নেতাদের স্বপ্ন সফল হলে, এখন যেমন বাংলাদেশে চলছে। রাজ্যের শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা যে হাতে পবিত্র সংবিধান ছুঁয়ে দেশ সেবা করবার শপথ নিয়েছিলেন, নির্বাচনের আগে দলীয় পতাকাকে গর্বে বুকে জড়িয়ে যে জনগণের কাছে ভোট ভিক্ষা করেছিলেন, যে জনগণকে আজীবন সুরক্ষা প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ সেই বিশ্বাস তারা ক্রমাগতই হারিয়ে ফেলছেন।

হিন্দু ঐক্য দেখলেই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন কেন? ইতিহাস সাক্ষী, হিন্দুরা কখনো কারোর অনিষ্ট করেনি। এখনো সভ্যতা ও ভদ্রতা আর ন্যূনতম পারিবারিক শিক্ষা যদি হিন্দু বিরোধীদের অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তারা হাতজোড় করে অন্তত ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দেহটাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে নিন পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে। □

ভারতীয় নির্বাচনে বিদেশি অর্থের করালগ্রাস

অর্ণব কুমার দে

আমেরিকায় ইলন মাস্কের দ্বারা ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি (DOGE) বিভাগটির কাজ শুরু হওয়ার পর ভারতবাসী জানতে পেরেছে যে ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অর্থের দ্বারা প্রভাবিত করার এক জঘন্য চেষ্টা চলছে। ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে ভারত এবং তার বাইরে USAID-নামক আমেরিকান প্রতিষ্ঠানটি ভারতের নির্বাচনে 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোটারদের উপস্থিতি বৃদ্ধি'-র জন্য বিপুল পরিমাণ ডলার খরচ করেছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই তহবিল সরবরাহের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কার স্বার্থে প্রেরিত হয়েছিল? ভারতের নির্বাচনে এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভোট দানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কী স্বার্থ রয়েছে?

এই বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মন্তব্য অনুযায়ী, ভারতীয় নির্বাচনে USAID-এর ফান্ডিং ভারতীয় গণতন্ত্রকে উন্নীত করার প্রচেষ্টা নয় বরং ভারতীয় গণতন্ত্রকে সংকটাপন্ন করার প্রচেষ্টা বলে গণ্য করা উচিত। 'ভারতে ভোট দানের হার বাড়াতে আমাদের কেন ২১ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হবে? আমার ধারণা, তারা বিশেষ কাউকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করেছিল। আমাদের ভারত সরকারকে বলতে হবে যে এটি একটি নয়া চাল।' এক কথায়, এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রবাদী সরকারকে ক্ষমতায় আসতে না দেওয়া।

যদিও ১৯৬০-এর দশক থেকে ভারতে USAID কার্যকর হতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোযোগ খাদ্য নিরাপত্তা থেকে প্রশাসনিক সংস্কারের দিকে সরে যায়। ২০১১ সাল থেকে তাদের ডেমোক্র্যাটিক ইলেকশনস অ্যান্ড পলিটিক্যাল প্রসেসেস (DEPP) প্রোগ্রামের মাধ্যমে, ভারত-নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য কনসোর্শিয়াম ফর ইলেকশনস অ্যান্ড পলিটিক্যাল প্রসেস স্ট্রেংথেনিং (CEPPS)-কে বার্ষিক ৩,১৮, ৬১৪ ডলারেরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। CEPPS-খাতে সর্বমোট মার্কিন ব্যয়বরাদ্দ ৪৮৬ মিলিয়ন ডলার ছিল বলে জানিয়েছে DOGE। এই ফান্ডিঙের ক্ষেত্রে USAID-এর সহযোগী ছিল ধনকুবের জর্জ সোরোস পরিচালিত একটি সংস্থা।

আর্থিক লেন-দেন সংক্রান্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, নির্বাচনের বছরগুলিতে সর্বোচ্চ অর্থ বিতরণ করেছিল CEPPS। ২০১৪ অর্থবছরে 'ভোটার সচেতনতা'র প্রচারের ক্ষেত্রে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতে পাঠানো হয়েছিল—যা আজকের বাজার মূল্য অনুযায়ী ১৮২ কোটি ভারতীয় টাকার সমতুল্য। এই তহবিলগুলি জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে বিভিন্ন সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল বলে সংবাদসূত্রের খবর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওই বছর এই সময়েই ভারত জুড়ে চলছিল নির্বাচনী প্রচার। ২০১৪ সালের মে মাসের পর প্রেরিত তহবিলের পরিমাণ ৮৩ শতাংশ কমে যায়। এটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এই তহবিল প্রেরিত হয়নি। সেই বছর ভারতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করাই ছিল এই তহবিল প্রদানের মূল উদ্দেশ্য। ২০১৯ সালেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। বিদেশি অর্থে পুষ্ট এবং USAID-প্রদত্ত অর্থসাহায্য প্রাপক ভারতীয় সংস্থাগুলি বৈদেশিক অর্থসাহায্য নিয়ন্ত্রণ আইন (FCRA) ভঙ্গ করায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে ভারত সরকার। এই কারণে সেই বার USAID-প্রেরিত তহবিলের বেশ কিছুটা অংশ আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ভারতে USAID-এর বরাদ্দ এবং বাংলাদেশের 'রাজনৈতিক পরিবেশ শক্তিশালীকরণ'-এর জন্য নির্ধারিত ২৯ মিলিয়ন ডলারের খরচের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেখিয়েছে যে কীভাবে সেই রাজনৈতিক পালা বদলে এই অর্থ অর্থবহ হতে পারে। যদিও অন্যদিকে ভারত তাঁর স্থিতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। মূলত ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীরতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্য এবং শাসনব্যবস্থার উপর নাগরিকদের বিশ্বাস, এই অর্থের অনর্থকে সাময়িকভাবে আটকে দিতে পেরেছে। যদিও নানাভাবে, বারবার ভারতে অশান্তি ও অস্থিরতা তৈরির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ অর্থের প্রকোপ সম্পূর্ণভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টলাতে পারেনি।

ভারত সম্পর্কে পশ্চিমি দেশগুলির বক্তব্য আর রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র রয়েছে? বিশেষত যখন তিনি দাবি করছেন যে ভারতের গণতন্ত্র 'খতরে মেঁ হ্যায়'। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইউরোপীয় ও আমেরিকান হস্তক্ষেপের জন্য তার আবেদন কী ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে?

এছাড়াও, USAID 'ভারতে পোশাক তৈরির কাজে যুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের একাকিত্ব দূরীকরণের' লক্ষ্যে একটি কর্মসূচির জন্য ৭,৫০,০০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছে। একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, এই তথাকথিত পরিযায়ী শ্রমিক কারা? উত্তর হলো, পোশাক তৈরির কাজে যুক্ত পরিযায়ী কারিগরদের ওস্তাগর বলা হয়, যাদের বেশির ভাগই মুসলমান। এইভাবে নানা কায়দায় কেন্দ্রীয় শাসকদলকে বেকায়দায় ফেলার লক্ষ্যে এই অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল।

ইলেকশন কমিশন

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সোনিয়া গান্ধী-মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে ২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস্ (IFES)-এর সঙ্গে ভারতের

নির্বাচন কমিশন (ECI) একটি মউ স্বাক্ষর করেছিল। প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এসওয়াই কুরেশি IFES-এর সঙ্গে চুক্তির করার কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু USAID থেকে ECI কোনো তহবিল পেয়েছে সে কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে এই সমঝোতাপত্রটি ছিল আন্তর্জাতিক স্তরের। তার দাবি অনুযায়ী চুক্তিটি ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন সংস্থার সঙ্গে USAID-এর স্বাক্ষরিত চুক্তির অনুরূপ এবং ECI-এর ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এই সমঝোতাপত্রটি তৈরি করা হয়েছিল। এই বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকার ভোটদান ব্যবস্থা ও ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার ভিতর বিস্তর ফারাক আছে। তাই বিদেশি নির্বাচনী নিয়মকানুন ও ব্যবস্থা ভারতে কোনো ভাবেই কার্যকরী নয়।

তবে কুরেশির বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য প্রকাশ পায়। কেউ অভিযোগ করেনি যে ECI (অর্থাৎ, ভারতীয় নির্বাচন কমিশন) USAID-এর অর্থ পেয়েছে। পরিবর্তে দেখা গিয়েছে যে, ভারতীয় ও বিদেশি— উভয় ধরনের একাধিক এনজিও-র মাধ্যমে এই অর্থ ভারতে প্রবেশ করেছে। যদিও কুরেশির বক্তব্য হলো, IIIDEM বা 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট' স্থাপন এবং ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন কমিশনের পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রূপায়ণে এই অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ফাঁস হওয়া তথ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে USAID-এর লক্ষ্য ছিল ভারতের সাধারণ নির্বাচনে 'প্রান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি'। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে USAID-এর এই পরিকল্পনাটি জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ দলগুলির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রশ্ন ওঠে ভারতের প্রান্তিক মানুষদের ভোটদানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থা কেন অর্থ ব্যয় করবে? প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের অপব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারে তা ব্যয় করলে সেই দায়িত্ব কাউকে বহন করতে হবে না। একই কায়দায় তিস্তা শীতলওয়াড় বা রানা আয়ুবরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বারবার রাজনৈতিক আক্রমণ হানে। এছাড়াও হিন্ডেনবার্গের মিথ্যা রিপোর্টের মতো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণ থাকে অব্যাহত। ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র।

IFES এবং IIIDEM সম্পর্কে এক নজরে

IFES (দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস্)-এর ওয়েবসাইট অনুসারে, 'জর্জ সোরোস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন হলো ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক শাসন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করে চলা সংগঠনগুলিকে অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি তহবিল প্রদানকারী সংস্থা। IFES 'জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে বিন্যস্ত একটি ফাউন্ডেশন' এবং সেখানকার অফিসের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতি বছর বিভিন্ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অনুদান প্রদান করে।' এখানে 'জাতীয়' বলতে আমেরিকান ও 'আঞ্চলিক' বলতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কথা বলা হয়েছে। এই মার্কিনি সংস্থাগুলির জটিল ষড়যন্ত্রের পিছনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল লেফট্দের মস্তিষ্ক কাজ করে। এদের উওকিস্ট-ও বলা হয়।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, ভারতে IFES-এর কর্মসূচিগুলি ২০১২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে USAID এবং গুগল, মেটা ও মাইক্রোসফট্-এর মতো সর্ববৃহৎ টেকনিকাল কর্পোরেশনগুলি থেকে দু'রকম তহবিল দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। যদিও এই পাবলিক-প্রাইভেট তহবিল মডেলটি বেশ উদ্ভাবনী। কিছু ক্ষেত্রে এটি তৈরি করে স্বার্থের সংঘাত। টেকনিকাল কর্পোরেশনগুলি ইমেল, সোশ্যাল মিডিয়া বা গুগল মিটের মতো প্ল্যাটফর্ম ও পরিষেবাগুলি প্রদান করেছে, তাতে ভারতীয়দের যেমন উপকার হয়েছে, ঠিক তেমনই আমেরিকান সংস্থাগুলি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। কিন্তু USAID-এর অর্থ কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা বেশ কঠিন।

IFES-এর সঙ্গে যে সমঝোতাপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার জেরে ECI ২০১১ সালে IIIDEM প্রতিষ্ঠা করে। IIIDEM-এর প্রশিক্ষণ মডিউলগুলিতে 'ইনক্লুসিভ ইলেক্টোরাল প্র্যাকটিসেস্' (অর্থাৎ সমাজের সব শ্রেণীকে নির্বাচনী ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া) এবং 'দলিত (অনগ্রসর শ্রেণীর) ভোটারদের একত্রীকরণ'-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ভারতে ১৯৫২ সাল থেকে তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষ তাঁদের ভোটদান করে চলেছেন। তাহলে তাঁদের নতুন করে জাগরণের কী প্রয়োজন? এছাড়া দলিত কারা? দলিত কথাটি আপেক্ষিক। যে কেউ তার নিজের যেকোনো অপ্রাপ্তির কারণ দেখিয়ে নিজেকে দলিত বলতে পারেন।

২০১৩ সালের IFES-এর একটি নীতিমালায় ভোটারদের বর্ণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হয়েছিল। এই বিষয়টি ২০১৬ সালে সংসদীয় বিতর্কে প্রতিপক্ষ দলগুলির মুখেও প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। এর পরিণতি ঘটে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিকভাবে তোলা স্লোগানে— 'জিতনি আবাদী, উতনা হক' (অর্থাৎ জনসংখ্যা যতটা, অধিকারও ততটাই হওয়া উচিত)। যেহেতু ভারতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা বেশি, তাই চাকরিতে তাদের বেশি প্রতিনিধিত্ব থাকবে— এই নির্বাচনী প্রলোভন তাদের দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ প্রণীত কাস্ট সিস্টেম (জাতপাতভিত্তিক ব্যবস্থা) ফিরিয়ে নিয়ে আসার আধুনিক প্রচেষ্টা চালায় কংগ্রেস। USAID-প্রদত্ত তহবিল সম্পর্কে DOGE-এর তথ্য প্রকাশের পর IFES-এর ভারত ও নেপালের সিনিয়র কান্ট্রি ডিরেক্টর বাসু মোহন তার X (পূর্বতন টুইটার) অ্যাকাউন্টটিই ডিলিট করেন।

এটি একটি প্রশ্নের উদ্রেক করে। ভারত সম্পর্কে পশ্চিমি দেশগুলির বক্তব্য আর রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র রয়েছে? বিশেষত যখন তিনি দাবি করছেন যে ভারতের গণতন্ত্র 'খতরে মেঁ হ্যায়ঁ'। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইউরোপীয় ও আমেরিকান হস্তক্ষেপের জন্য তার আবেদন কী ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে?

DOGE-প্রকাশিত তথ্যাবলী ভারতীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিদেশি প্রভাবের বিপদ সংকেত। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংসের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচনগুলিতে USAID-এর তহবিলের ঢালাও সরবরাহ, নির্দিষ্ট ভোটার ও জনগোষ্ঠীর উপর তাদের নজর, নানা দেশি-বিদেশি সংস্থাকে ফান্ডিঙের মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো বিষয়গুলি এক বৃহত্তর ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করে। দেশবিরোধীদের মুখোশ উন্মোচনে DOGE-এর পদক্ষেপ ও সতর্কবাণী— ভারতের মধ্যে সক্রিয় বিদেশি অর্থপ্রাপক সংস্থাগুলি এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত সকলের ব্যাপারে স্বচ্ছ তদন্তের দাবি রাখে। □

বিরোধীদের উসকানি বন্ধ হলে মণিপুরে শান্তি ফিরবে

ক্ষমতাশীল ভারতীয় জনতা পার্টিকে কতটা দায়িত্বপূর্ণভাবে কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় তা শিখিয়ে দিল মণিপুর। কুকি জঙ্গিদের হাতে আক্রান্ত মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিধায়কদের বাড়ি। এই পরিস্থিতিতেও যাতে মণিপুরবাসী আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় সেই জন্যই মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের ওপর ভরসা রেখেছিলেন। একেবারে ঠিক কাজ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে প্রত্যেক ভারতবাসী সমান। দেশবাসীর অধিকার যারা ভঙ্গ করে সেইসব জঙ্গিদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে অমিত শা-র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সদা জাগ্রত। ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল উত্তরপূর্ব সীমান্ত। মায়ানমার থেকে মণিপুরে প্রবেশ করতে চাইছিল কুকি জঙ্গিরা।

মায়ানমারের জঙ্গিদের ব্যবহার করে ভারতে সন্ত্রাসের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরা। ভারত-মায়ানমার সীমান্ত সিল করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। জঙ্গিদের হামলার ছক প্রসঙ্গে মণিপুরের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিংহ জানিয়েছেন, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে যেন কোনো কারণে অনুপ্রবেশ না ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ হাজারের বেশি আধাসামরিক সেনা পাঠিয়েছে মণিপুরের স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের মধ্যে ২ হাজার জন ভারতের কেন্দ্রীয় পুলিশের এলিট শাখা সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেসের (সিএপিএফ) সদস্য। বাকিরা সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের। ২০২৩ সালের মে মাসে মণিপুরের সংখ্যাগুরু ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী জাতিগোষ্ঠী মৈতেইকে তপশিলি জাতির মর্যাদা দেয় মণিপুর হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে রাজ্যের খ্রিস্টান কুকি জাতিগোষ্ঠীর লোকজন। কুকিদের এই আন্দোলন অচিরেই রূপ নেয় সাম্প্রদায়িক হিংসায়। গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই হিংসায় নিহত হয়েছেন মৈতেই ও কুকি জাতিগোষ্ঠীর শতাধিক নারী-পুরুষ এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

রাজ্যের জিরিবাম এলাকায় তিনজন নারী ও তিনজন শিশু নিহতের ঘটনা ফের উসকে দিয়েছিল হিংসা। অশান্ত মণিপুরে শান্তি ফেরাতে পাঁচ হাজারের বেশি আধাসামরিক সেনা নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে রাজ্য সরকারকে সহায়তা করবে। উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মহারাষ্ট্রে তার নির্বাচনী সমাবেশ বাতিল করে মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতিরও পর্যালোচনা করতে ছুটে এসেছিলেন দিল্লি। ইম্ফল উপত্যকার বিভিন্ন জেলায় জঙ্গিরা তিনজন বিজেপি বিধায়কের বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয় কিন্তু তৎপর নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গিদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। বিরোধী দলেরও উচিত যে কোনো মূল্যে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখা। কুকিদের রাজনৈতিক হিংসায় ইন্ধন না দিয়ে প্রত্যেক ভারতবাসী মণিপুর নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন সেটা বোঝানোর দায়িত্ব নিক কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলো। কুকিদের জানতে হবে হিন্দুত্ব হলো একটি মেলবন্ধন। হিন্দুত্ব হলো সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও ধর্মীয় পরিচয়ের একটি ধারণা। অবশেষে সবদিক বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছে। আশা করা যায়, এরপর মণিপুরে সবরকম রাষ্ট্রবিরোধী উসকানি বন্ধ হবে।

—প্রদীপ মারিক,
বারুইপুর, দ: ২৪ পরগনা।

আর এস এস রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে অবস্থান করে

সময়ের দাবি ও নিয়মকে সঙ্গী করেই পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের শাখা বিস্তারে সফল হয়েছে। সবকিছু হারিয়ে সিপিএম এখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতিকে নকল করে তাদের সংগঠনকে চাঙ্গা করবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেব সঙ্ঘের শাখায় রাষ্ট্রভক্ত নাগরিক তৈরি করার প্রচেষ্টা চলে। সিপিএম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুকরণে কিশোর মনকে ছুঁয়ে সংগঠন তৈরি করবার যে অপপ্রচেষ্টা চালাবে সেই অপপ্রচেষ্টা অঙ্কুর অবস্থাতেই বিনষ্ট হবে। কারণ সিপিএম তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কিশোর কিশোরীদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে উদ্যোগী। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরের একটি সংগঠন। যে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য কিশোর বয়স থেকেই দেশের যুবক-যুবতী শারীরিক ভাবে সক্ষম থাকুক এবং ভারতমাতার সেবাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিজেপিকে চালায় বলে যে অপপ্রচার তৃণমূল এবং বামপন্থীরা করে আসছে সেটি সর্বৈব ভুল এবং একটি অপকৌশল এটি বারবার প্রমাণিত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশকে ভারতমাতার উপযুক্ত সন্তান উপহার দিতে বদ্ধপরিকর। সঙ্ঘের শাখাগুলিতে রাষ্ট্রবাদী নাগরিক তৈরি করবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

ভারত মাতার সেবা এবং পূজাই একজন স্বয়ংসেবকের একমাত্র উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কোনোদিন কোনো রাজনীতির ভিতরে ছিল না, নেই এবং আগামীতেও থাকবে না। ভ্রান্ত প্রচার, অপপ্রচারের জাল ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এগিয়ে চলছে, চলেছে এবং আগামীতে চলবে। সিপিএম তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠবার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার অনুকরণ করবার যতই চেষ্টা করুক না কেন আদর্শ সব থেকে একটি বড়ো বিষয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ রাষ্ট্রবাদী। রাষ্ট্রের স্বার্থ ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অন্য কিছু বোঝে না, বোঝে না রাজনীতি।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজ রোড, উ: ২৪ পরগনা।

ফঃ ৩

তদন্ত সাপেক্ষে চিহ্নিত করা ভুয়ো ভোটারদের ফর্ম নম্বর ৬ পরীক্ষা করা হোক

বিশ্বপ্রিয় দাস

এবার কেমন যেন দিশেহারা রাজ্যের শাসক দল। কেন এই কথা বলা? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সাধারণ মানুষের থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রাজ্যের শাসক দল। প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। উলটোদিকে শক্ত-পোক্ত বিরোধী আন্দোলন শাসক দলের ছন্নছাড়া অবস্থাকে কীভাবে আরও টালমাটাল অবস্থায় ফেলে দেবে, তা থেকে বেরোনোর রাস্তাটাকেই খুঁজে পাচ্ছে না। মনে রাখা দরকার, যে কোনো আন্দোলনে সাধারণ মানুষের শাসক বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যাবেই।

সম্প্রতি নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কর্মীসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দল সুপ্রিমো নানা হুংকার ছেড়েছেন। ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জেতার আসন সংখ্যা ২১৫ লক্ষ্য দিয়েছেন। আবার সেই পুরোনো রেকর্ড, ভুয়ো ভোটারের ধুয়ো তুলেছেন। প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে বলেছেন খেলা হবার কথা। আরও অনেক কথা তিনি বলেছেন। এখানে রাজ্যের শাসক দলের দ্বিতীয় কম্যান্ড ইন চিফ অবশ্য একটু আড়ালে থাকা সত্ত্বেও তাঁর ভাষণে তিনি বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করেছেন। সিবিআই-কেও একহাত নিয়েছেন। এখানেই প্রশ্ন, তাঁকে কেন এত পিছনের দিকে রাখলেন দলনেত্রী? কেনই-বা এখন প্রজেক্টেড মুখ্যমন্ত্রী নন, সেকেন্ড ইন চিফ। বিষয়টা নিয়ে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী নিজের কর্তৃত্ব যেমন হাত ছাড়া করতে চাইছেন না, তেমনি নিজের কাছের, ঘরের মানুষটি যে দলের মধ্যে দুটি মেরু তৈরি করেছে, সেটাও তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তিনি নিজের অজান্তেই এটি বলে ফেলেছেন, তিনি নাকি দলের মধ্যে থাকা বিশ্বাসঘাতকদের বেশ কয়েকদিন ধরেই নাকি চিহ্নিত করে ফেলেছেন।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাঁরা কারা? তাঁরা কার অনুগামী? তাঁরা কি দলনেত্রী বিরোধী? তাঁরা কি দলের গোপন পরিকল্পনা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে? তাঁরা কার নির্দেশে এই কাজ করছে? যদি চিহ্নিত করেই থাকেন দলনেত্রী, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কেন নিচ্ছেন না তিনি, তিনিই তো দলের সব। অন্যদিকে তিনি সেই বাম আমলের ফর্মুলায় যেতে চাইছেন কেন? সেই ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ। তাঁর রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে উঠে আসা ভোটার তালিকায় সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবির আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, ২১ জুলাইয়ের সেই দিনে। এবারও মানুষের মনে বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা তিনি প্রকারান্তরে করে ফেলেছেন। এই ভুয়ো ভোটারের বার্তা দিয়ে।

ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো সবই জানেন অথবা না জানার একটা ভান করেন। তাঁর হাতে থাকা সরকারি কর্মীরাই ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজটি করে থাকেন। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। একেবারে রুট লেবেলে বিএলও-রা নাম তোলা, সংশোধন, বর্জনের কাজটি করেন একেবারে বাড়ি বাড়ি ঘুরে। এরপর শুনানি হয়। তারপর নামটি যথাযথ ব্যক্তির কিনা, সেটি ভেরিফিকেশন হয়, ব্যক্তির দেওয়া তথ্যের সঙ্গে, দেওয়া নথির সঙ্গে মিলিয়ে। এগুলি সবই করেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। এখানে নাক গলাতে আসেন না দেশের নির্বাচন কমিশনারের কেউ, কেন্দ্রীয় শাসক দলের কেউ। আরও একটি কথা হয়তো শুনলে অবাক হতে হবে, যদি কারোর একই এপিক নম্বরে দু' জায়গায় নাম থাকে, সেটি নিমেষে চিহ্নিত করে নির্বাচন কমিশন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভেরিফিকেশন করেন, আর একটি নাম বাদ যায়।

অপরদিকে কেউ যদি বিয়ে বা অন্য কোনো কারণে, যেমন ঠিকানার পরিবর্তন, বিধানসভার পরিবর্তন করতে চান, তাহলে যেখানে নাম তুলবেন সেটির যেমন উল্লেখ করবেন, তেমনি ওই এপিকে অন্য কোথাও নাম থাকলে সেটির পার্ট নম্বর, বিধানসভার নাম ও সিরিয়াল নম্বর অবশ্যই লিখতে হয়। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য বিধানসভায় থাকা নামটি কেটে যায়। এই প্রক্রিয়াগুলি পেরিয়ে তবেই একটি ভোটার তালিকা তৈরি হয়। আরও অবাক হবার কথা, বিএলও-দের তরফে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে জানাবার জন্য, যে নামগুলি নতুন উঠছে বা যেগুলি কোনো কারণে বাদ পড়ছে, তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা বুথের বাইরে যেমন টাঙিয়ে দেওয়া হয় দেখাবার জন্য, তেমনি প্রকাশিত ভোটার তালিকায় নতুন নাম বা বর্জিত নামও টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

ফলে দলনেত্রী একটু কোথাও যেন মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন না? এখানে রাজনৈতিক মহলের একাংশের অনুমান, পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী ভোটারদের চিহ্নিত করে, ধরে ধরে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই চালাকি ঢাকতে এই গান গাইছেন নেত্রী। তাঁর সরকারি কর্মীরাই তো নাম তোলা বা বাদ দেবার কাজটি করেন। তাহলে কি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন তাঁরা? রাজনৈতিক মহলে একাংশ বলছেন, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা হোক এটাই সবাই চায়। সেখানে এভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে চক্রান্ত, সেই খেলা কেন খেলতে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী? পায়ের তলার মাটি আলগা হয়ে গেছে বলে? ভোটার তালিকায় এই ভুয়ো নামের ছড়াছড়ি, তাঁর দলের মানুষেরা নাকি ধরে ফেলেছেন, তাহলে যে যে পার্টে এই ঘটনা ঘটেছে, সেই পার্টের বিএলও-কে ডেকে জিজ্ঞাবাদ করুক প্রশাসন। ফর্ম নম্বর-৬ তদন্তের খাতিরে পরীক্ষা করুক প্রশাসন। সেটি হোক সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সামনে। তাহলে দুধ আর জল পরিষ্কার হয়ে যাবে। □

চালাকি ঢাকতে গান গাইছেন নেত্রী। তাঁর সরকারি কর্মীরাই তো নাম তোলা বা বাদ দেবার কাজটি করেন। তাহলে কি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন তাঁরা?

সন্তানের সংস্কার দানে মায়েদের ভূমিকা

মৌ চৌধুরী

'মা' একটি ছোট্ট শব্দ। কিন্তু শব্দটার ব্যাপ্তি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এর বিচার বিশ্লেষণ এমনকী মূল্যায়ন করা সহজ নয়। যে নারী সন্তান ধারণ করেছেন, লালন পালন করছেন, সঠিকভাবে তাকে শিক্ষা ও সংস্কারের মানুষ করেছেন, সেই সমস্ত নারীকে সমাজ, ইতিহাস মনে রাখে। এই সন্তানরা পরবর্তী সময়ে সমাজে বিশেষ অবদান রাখে। তাঁরা মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পথ দেখান। এই সন্তানদের জন্ম দিয়ে ও লালন পালন করে যে মায়েরা তাদের 'মানুষ' করেছেন তাঁরা আদর্শ ও স্মরণীয়।

কিন্তু বর্তমান সময়ে সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে সন্তানদের বিভিন্ন অনৈতিক কাজের জন্য অনেকেই মায়েদের দিকে নানাভাবে আঙুল তুলছেন। মা হিসেবে সন্তানের প্রতি কতটা দায়িত্ববান, সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মায়েরা কতটা ওয়াকিবহাল তাই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। সুসন্তান যেমন দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ, তেমনি পরিবার ও পরিজনের কাছেও সম্পদ। দেখা গিয়েছে, গত সত্তরের দশক থেকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তার সামাজিক প্রভাব ব্যাপক ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনের গতিমুখ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। জীবন জীবিকার খোঁজে যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়েছে। পারিবারিক সম্পর্কগুলি নষ্ট হতে শুরু করেছে।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে পৃথিবী হাতের মুঠোয় এসে যাওয়ার পর থেকে বিশেষ করে গত নব্বই দশক থেকে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এর প্রভাবে নবীন প্রজন্ম সৃষ্টিকারী বাবা-মায়েদের বেশ বড়ো একটা অংশের ভেতর তাদের মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে তারা শিকড় ছিন্ন করে বেরিয়ে গিয়েছে। পিছু টানহীন মনোভাব আর পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করাকে তারা এক ধরনের স্বাধীনতা বলে মনে করেছে। এই কারণে ফ্ল্যাট কালচারে অভ্যস্ত জীবনে সন্তানকে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে যে কোনো মূল্যে 'জীবনে প্রতিষ্ঠিত' হতেই হবে এমনই মানসিকতা নিয়ে তাঁরা সন্তানকে বড়ো করছেন। অনেক মহিলার মনোভাব হলো পারিবারিক জীবনে স্বামী ও সন্তান নিয়ে একা থাকার। সম্পর্কের বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে সঙ্গে না রাখা কিংবা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনা এখন প্রায় সব ঘরেই ঘটে চলেছে। মায়েদের এই প্রবণতায় সন্তানকে একাকিত্বের মধ্যে রেখে জীবনের দীশাহীন প্রতিযোগিতায় নামিয়েছে।

জীবনাদর্শকে পিছনে ফেলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরের কেরিয়ারের পেছনে ছোটাকে অনেকেই সমর্থন করেন। কিন্তু পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের চেয়েও কেরিয়ারের পিছনে লক্ষ্যহীন ভাবে দৌড়ানোর ফলে পারিবারিক বন্ধন ও ভালোবাসার বন্ধনটা ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ফলে সমাজের প্রতি কোনো দায়িত্ববোধই থাকছে না। যে মা নিজের দায়িত্ব, কতর্ব্য ও পরিবারকে উপেক্ষা করে সন্তানকে কেরিয়ারমুখী প্রতিযোগিতার বাজারে নামিয়েছে সেইদিনই সেই নারীর নাড়ির টান ছিন্ন করে সন্তান দূরে সরে গেছে। পরবর্তী সময়ে সেই মাকে আত্মীয়হীন, বন্ধুহীন আয়ানির্ভর সংসারে একা থাকতে দেখা গেছে।

ভারতীয় নারী সর্বদাই নিঃস্বার্থভাবে সন্তান ও সংসারের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে এসেছে। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মা হিসেবে একজন নারীকে গড়ে তোলা বড়ো বিষয়। সন্তানকে কীভাবে প্রকৃত মানুষ করতে হবে, সন্তান ধারণের সময় থেকেই তার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। একটি সুস্থ সবল সন্তানের জন্ম দেওয়া, পরবর্তীকালে তাকে সুন্দর পৃথিবীর উপযোগী করে তোলা, শরীর-স্বাস্থ্য-শিক্ষা দীক্ষায় সব ব্যাপারে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পৃথিবীর রূপ রস গন্ধের আস্বাদ দেওয়ার পাশাপাশি প্রকৃত নীরোগ ও দীর্ঘ জীবন লাভ কীভাবে সন্তান করবে সেই জ্ঞান মায়ের কাছ থেকেই আসে। একইভাবে সমাজ ও পরিবারের দায়িত্ব শেখানোও মায়ের কর্তব্য। হিংসা ও কুসঙ্গ থেকে দূরে রাখার প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের। পাশাপাশি মায়ের প্রতি অনুগত না হলে সেই সন্তানকে মানুষ করা কষ্টকর হয়। সেবার মনোভাব প্রথম থেকেই থাকা দরকার। দেখা গিয়েছে বৃহৎ পরিবারের সন্তানরা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের বড়োদের কাছ থেকে সুশিক্ষা পায়। ক্ষুদ্র পরিবারে যেসব মা সন্তানকে বড়ো করে সেই সব সন্তানের লোভী, স্বার্থপর, হিংসাপরায়ণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। চিকিৎসকদের মতে সন্তান ধারণের সময় থেকেই মায়েদের রুচিকর বই পড়া, ভালো ছবি দেখা, ভালো গান শোনা সবথেকে ভালো। নিজেকে কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ ও সাংসারিক কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে কিছু ধর্মীয় কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং অল্প সময়ের জন্য হলেও প্রার্থনা যোগাসন, প্রাণায়াম, প্রাতর্ভ্রমণ করা হলে সন্তানের জন্মের আগে থেকেই নিজের ও সন্তানের সুফল অবশ্যই পাওয়া যায়। অপ্রয়োজনে বাইরে ঘুরে বেড়ানো, ফাস্টফুড খাওয়া, মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার, নিজের শরীর স্বাস্থ্যের খেয়াল না রেখে, বিনা কারণে ও নিয়ম-কানুন না মেনে, ইচ্ছা মতো চলাফেরা করা ভবিষ্যতের জন্য শুভ নাও হতে পারে। অযুত সন্তানের মা সারদা দেবী বলেছেন, নারীকে মা হিসেবে তৈরি করতে হলে রাগ, হিংসা বিবেকহীন কাজকর্ম স্বার্থপর মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। সুঅভ্যাস যখন নিজের মধ্যে তৈরি হবে সন্তানও তাই পাবে।

সন্তানের মনোযোগ বাড়ানোর কৌশল

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মনোযোগী ছাত্রকে কখনো নম্বরের পিছনে ছুটতে হয় না। সাফল্য নিজেই ধরা দেয় তার কাছে। পুরনো এই আপ্তবাক্য আজও ফিকে হয়নি। কিন্তু মনোযোগ অতি বিষম বস্তু। তাকে আয়ত্তে আনা সহজ নয়। কোন পথে সন্তানের একাগ্রতা বাড়িয়ে তুলবেন?

স্থিরতা ও ধৈর্য : একাগ্রতার মূল মন্ত্রই এই দুই তারে বাঁধা। তবে আধুনিককালে এই মনঃসংযোগের ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর। সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানি থেকে নিত্য জীবনের নানা টুকিটাকি ভাবনা বিভ্রান্ত করে আমাদের। এর খেসারত সবচেয়ে বেশি দিতে হয় ছাত্রাবস্থায়। শুধু মন দিয়ে অঙ্কটা কষতে পারছে না বলে খাতায় থেকে যাচ্ছে 'সিলি মিসটেক'। কোথাও আবার বারবার পড়িয়ে দেওয়া বিষয় ভুলে যাচ্ছে বাড়ির খুদে সদস্যটি। নম্বরে পড়ছে তারই ছাপ।

অমনোযোগী হওয়ার নেপথ্যে শুধুই ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ দিতে নারাজ শিক্ষকরা। তাঁদের মতে, আধুনিক গ্যাজেটস, সব কাজে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বাড়াবাড়ি, অসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতেও স্মার্টফোন পৌঁছে যাওয়া সবকিছু মিলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে তৈরি হয় অস্থিরতা। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের জগতের পরিসর বেড়েছে ঠিকই কিন্তু বাড়ির পরিসর হয়েছে ছোটো। তার উপর রয়েছে ছোটো পরিবারের প্রভাব। মন খুলে কথা বলতে পারার মতো পরিজনের সংখ্যাও কম। বাবা-মা কর্মব্যস্ত। বাড়ি ফিরে হয় মোবাইল নয়তো ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়েছেন। ভাই-বোন নেই। ঠাকুমা-দাদু নেই। শিশু ও কিশোর মনের দোসর হয়ে ওঠার মতো কেউ নেই। ভাঙা মন ও দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা নিয়ে দিন কাটায় শিশুরা। সুতরাং যাবতীয় গল্প, আলোচনা সবই সোশ্যাল সাইটে। গেমিঙের যাবতীয় গল্প, আলোচনা সবই সোশ্যাল সাইটে। এর সঙ্গেই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে গেমিঙের নেশা। আজকাল শিশুরাও কোডিং জানে, গেমিঙের নানা কঠিন ফর্মুলা মুখস্থ বলে দেয়। কিন্তু সেই শিশুই দেখা যাচ্ছে সহজ অঙ্ক ভুল করছে।

মনোযোগ বৃদ্ধি ও একাগ্রতার ক্ষেত্র অনেকটাই পারিবারিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সন্তানকে যত শান্ত ও সুন্দর শৈশব দেবেন, যে কোনো কাজে তার মনোনিবেশ তত বেশি হবে। সন্তানের বয়স ১৬ পেরলে তার বন্ধু হয়ে ওঠার কথা আমরা বলি বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ষোলোটা বছর ধরে একাকিত্বের মোড়কে জীবন কাটিয়ে ফেলা কিশোর বাবা-মাকে হঠাৎ বন্ধু হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে দেখলে তখন আর তাঁদের অতটা বিশ্বাস করে না। আগেই বাড়ি ও পরিবার সম্পর্কে তার মনে নেতিবাচক ধারণা মজুত হয়ে যায়। তাই বন্ধু হতে হবে প্রথম থেকে। তবে বাবা-মায়ের প্রতি সম্ভ্রম যেন চলে না যায়। ওকে মন খুলে কথা বলতে দেওয়ার পরিসর দিতে হবে। মনের মধ্যে চলা নানা প্রশ্ন ও দ্বিধা যাতে ওরা ভাগ নিতে পারে অভিভাবকদের সঙ্গে! বিশেষ করে ১৬-১৮ বছর বয়সিদের নানা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হয়। একাগ্রতা, মনোযোগ দুই-ই তাদের কেরিয়ারে বেশি প্রয়োজন হয়। এসময় তাদের নানা প্রত্যাশার চাপও পূরণ করতে হয়। তাই শিশুকাল থেকেই মনোযোগ বাড়ানোর পদ্ধতি জানতে হবে।

মোবাইলে কম মন দিন : সন্তান তাই শেখে, যা বাড়িতে দেখে। নিজেরাও কাজের বাইরে সন্তানের সামনে মোবাইলে ব্যস্ত থাকবেন না। এতে তারও মোবাইলের প্রতি টান ও নেশা তৈরি হবে না। দিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় সন্তানকে বেঁধে দিন। সেই ১ ঘণ্টা বা ৩০ মিনিট শুধু মোবাইল দেখবে। এতে পড়ার সময় মোবাইলের দিকে মন যাবে না। তবে উঠতি বয়সের সন্তান কী ধরনের সাইট খুলছে, কী দেখছে তা বাবা-মাকেও খোঁজ রাখতে হবে। প্রয়োজনে সার্চ হিস্ট্রি দেখে রাখুন। তবে নিজেরা মোবাইলের জটিলতা না বুঝলে মোবাইল দেখার সময় গল্পের ছলে তার কাছেই থাকুন।

দিনের পড়া দিন : প্রতিদিনের পড়াশোনা প্রতিদিন করতে হবে। সেখানে পিছিয়ে পড়লেই তার নোট তৈরি করে বা অনলাইনে রেকর্ডিং ক্লাস দেখে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হবে। হাতে ধরে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি না হলে পড়া আত্মস্থ হয় না। অনলাইনে অধ্যায় তৈরি করতে গিয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী ওয়েব দুনিয়ার নানা হাতছানির শিকার হয়, যা মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়।

বিরতি দিয়ে পড়ুক : বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, একটানা ৪০-৪৫ মিনিট মনোযোগ এক জায়গায় ধরে রাখা সম্ভব। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা না পড়ে প্রতি ৪৫ মিনিট অন্তর ছোটো বিরতি নিতে দিন সন্তানদের। দশ মিনিটের বিরাম সেরে ফের ফিরুক। সময় ধরে পড়াশোনাকে ছোটো ছোটো পরিসরে ভাগ করে নিলে পড়া বেশি মনে থাকে। তবে ওই ৪০-৪৫ মিনিট দুনিয়া রসাতলে গেলেও অন্যদিকে মনে দেওয়া যাবে না। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব কারও ডাকে সাড়া দেওয়া চলবে না। মোবাইল থাকুক অন্য ঘরে।

ধ্যান অভ্যাস করান : খুব ছোটোবেলা থেকে ধ্যানের অভ্যাস করালে তার সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যায়। মনোযোগী করে তোলার অন্যতম সেরা পদ্ধতি এটি। অনেক শিশু মাত্রাতিরিক্ত চঞ্চল। এক জায়গায় এক মিনিট মনোনিবেশ করতে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে খুব অল্প অল্প সময় ধরে ধ্যান করান। প্রথমে ৩০ সেকেন্ড, তারপর এক মিনিট এমন করতে করতে একদিন ঠিক খুদে সদস্যটি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। একান্ত না পারলে কোনো মেডিটেশন ট্রেনারের সাহায্য নিন।

আত্মবিশ্লেষণ : রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনে কী কী লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে আর কী কী বাদ থেকে গেল, সেই তালিকা মনে মনে তৈরি করতে হবে। সারাদিনের কতটা সময় সত্যি কাজে লাগল তার হিসেবে নিজের কাছে থাকা জরুরি।

খেলতে দিন : মনোযোগ বাড়ানোর অন্যতম উপায় খেলাধুলো। সন্তানের পড়ার সময় কমে যাবে ভেবে অনেক বাবা-মা তাদের খেলতে দেন না, অন্য সব শখ বন্ধ করে দেন। এর ফলে মনোযোগ কমতে থাকে। শরীরচর্চার জন্য কিছুটা সময় তার জন্য বরাদ্দ করুন। □

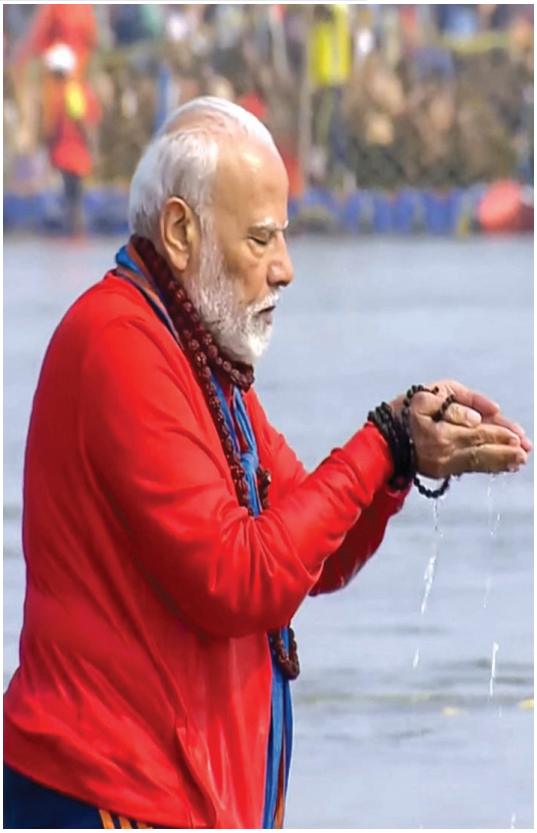

পশ্চিমবঙ্গের ইসলামীকরণ যতভাবে করা যায়, ততভাবেই তিনি উদ্যত। তাই 'মৃত্যুকুম্ভ' বলাটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যে ভঙ্গিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাম, কবি কৃত্তিবাসকে অস্বীকার করেন, ঠিক একই তালে তিনি মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেন।

হিন্দু তাচ্ছিল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে মমতার মুখে 'মৃত্যুকুম্ভ'

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

বুদ্ধির কৃশতার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ রাজনৈতিক তোষণ। পৃথিবীর ইতিহাস বলে, তোষণ নীতি কখনো সুফল দেয়নি। ব্রিটিশরা একদিন, ১৯৩০ সাল নাগাদ ভেবেছিল নাৎসি তোষণ করবে। আর যুদ্ধ হবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জেমস ম্যাকডোনাল্ড মনে মনে ভাববেন তোষণ করলে এ যাত্রায় বেঁচে যাবেন। কিন্তু কী হলো? ভার্সাই চুক্তি ভাঙল নাৎসি সরকার। হিটলারকে প্রথমটায় বেশ শান্ত লোক ভেবেছিল ব্রিটিশ। ভেবেছিল তোষণ করলে লোকটা বেশ থাকবে। তোষণ করতেই হলো ব্রিটিশদের, কারণ তাদের দেশে তখন চলছে দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন। তারপরের ইতিহাস সবাই জানি। সেই তোষণপুষ্ট নাৎসি বদলে দিল যুদ্ধের চরিত্র, ইতিহাস, দেশের সীমান্ত, হিংস্রতা হয়ে গেল পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতি বিদ্বেষ, ইহুদি বিদ্বেষে পাইকারি হারে নরহত্যা— নাৎসি তোষণেরই পরোক্ষ ফল। তোষণ নীতি বিশ্বযুদ্ধ থামাতে পারেনি।

মমতা ব্যানার্জি কী করে ভাবছেন আজকেও মুসলমান তোষণ করে তিনি জয়ী হবেন? তোষণ নীতিতে মুসলমান ভোটব্যাংকে নিরবিচ্ছিন্ন অঙ্ক বজায় রাখার প্রবল বাসনায় তিনি হিন্দুদের আবেগ নিয়ে কমবার তো ছেলেখেলা করেননি! পশ্চিমবঙ্গের বড়ো অংশের হিন্দু এখনো 'সেকুলার' ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন, তার ওপর আবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ছোট্টো উপহার ঘরে ঘরে। তাই মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলার পরেও তিনি পার পেয়ে যান। টুকটাক নিন্দা হয়। কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, বিক্ষোভ পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে দেখা যায়নি। এবারের মহাকুম্ভ বিশ্বের ইতিহাসে মানবতার দরবারে নতুন অধ্যায় খুলল। ৬৬ কোটি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, আগ্রহ, নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ত্রিবেণী সঙ্গমে একত্রিত হওয়ার অখণ্ড মিলনের স্বাদ নিল। সারা পৃথিবী উন্মুখ, বিস্মিত এই মহাকুম্ভ আয়োজনে। কোটি কোটি মানুষের উপচে পড়া ভিড়। মহামেলা প্রাঙ্গণে সেই জনপ্লাবনে ভাষা-ধর্ম-বর্ণ-জাতি সব মিলেমিশে এক। যার ব্যবস্থাপনায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, প্রশাসনিক পরিকল্পনা। অথচ ঐতিহ্য সংস্কারে তা যেন অনাদিকালের বার্তা বয়ে আনছে।

কুম্ভমেলা শাশ্বতকাল ধরে অমৃতের সন্ধান দিচ্ছে। ১৪৪ বছরে একবার মহাকুম্ভ, এই সুযোগে মাহেন্দ্রযোগের পুণ্যে আমরা সবাই স্নাত। মৌনী অমাবস্যার দিন মাহেন্দ্র প্রহরে হঠাৎ ভক্তরা হুড়মুড়িয়ে ছুটছেন নোজ পয়েন্টের দিকে। অর্থাৎ যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও পৌরাণিক সরস্বতী নদীর সঙ্গম। যা একটা ত্রিভুজের মতো এলাকা। ২৬ হেক্টর সেই সঙ্গম স্থল। অথচ শাস্ত্রী ব্রিজ থেকে সঙ্গম নোজ পর্যন্ত ১৬৫০ মিটার এলাকা জুড়ে ঘাট নির্মিত ছিল যা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সুরক্ষায় ঘেরা। আরও একটুবেশি পুণ্য লাভের আশায় কিছু মানুষ চিরকালই বেশি দিশেহারা হন। আর কখনো আসা হবে তো, এই জীবনে এমন সুযোগ আর আসবে না যে! আবেগ পাগল সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন ইচ্ছে শক্তির প্রবল উন্মাদনায় বিশেষ সময়ে জোয়ারের বেগে সেই বিশেষ নির্দিষ্ট বিন্দুতেই বিশুদ্ধতম জীবন অমৃতের সন্ধানে ধেয়ে যায়। বিচারবিহীন, বল্গাহীন এই উন্মাদনা এবং তাতে পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যু, তা কি সত্যিই মোক্ষের সন্ধান দিল? তারা তো মোক্ষের সঙ্গে অবহেলাই

করলেন অতিরিক্ত আবেগে। মমতা ব্যানার্জি হাজার বার সমালোচনা করতে পারতেন কেন পুলিশ প্রশাসন আরও কঠোর ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা তাদের আরও অনেক বেশি সতর্ক থাকা উচিত ছিল ইত্যাদি। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক সমালোচনা করতেই পারতেন। নিশ্চিতভাবে তা তাঁর রাজনৈতিক ভাষণ ভঙ্গি, আমরা সবাই তা দেখেই অভ্যস্ত। এবং তা ওনার সাংবিধানিক অধিকারও। কিন্তু তিনি কী করলেন? তাঁর চেতনে, অবচেতনে মুসলমান ভোটব্যাংক নিজের সুরক্ষা খোঁজে। যথারীতি তিনি কোটি কোটি মানুষের আস্থার, প্রাণধর্মের টুঁটি চেপে, ওই দুঃখজনক মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বললেন। শব্দ প্রয়োগের জন্য হিন্দুমাত্র লজ্জিত নন, ক্ষমা চাওয়া তো দূর।

তাঁর প্ররোচনায়, অসম্মানজনক মন্তব্যে হিন্দুধর্মের বিন্দুমাত্র কিছু যায় আসে না। তবুও মনে রাখতে হবে তিনি তো কেবল মুসলমানদের মুখ্যমন্ত্রী নন বা জাতীয় রাজনীতির স্তরে মুসলমানদের প্রস্তাবিত বিরোধী নেত্রী নন। তিনিতো পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বড়ো অংশের ভোটটাও পাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের থেকেও লক্ষ লক্ষ মানুষ মহাকুম্ভের আহ্বানে ধাবিত। গত ৭ জানুয়ারি এক রিপোর্ট পেশ হয়েছিল শুধুমাত্র, ওয়েবসাইটেই ১৮৩টি দেশের ৩৩ লক্ষ মানুষের সমাগম। সব মানুষের আবেগ আস্থা, ভারতের সংস্কার-সংস্কৃতি হিন্দুধর্মেরও উর্ধ্বে ভারতের যে নিষ্ঠার আধ্যাত্মিক স্রোত সরস্বতী নদীর মতো সর্বত্র বিরাজমান ও বহমান, তাতে রাশি রাশি অবিচার তাচ্ছিল্য মিশন মমতা ব্যানার্জির 'মৃত্যুকুম্ভ' নামক নিকৃষ্ট রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডায়। তোষণ রাজনীতিতে তিনি অসম্ভব ভরসা রাখেন বলেই তো বিগতদিনে খোলা রাজনৈতিক মঞ্চে বিকৃত সরস্বতী শ্লোক আউড়ে ছিলেন। মহামান্য কলকাতা শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন হয়, কারণ সেদিন মহরম ছিল। সরস্বতীপূজা বন্ধ রেখে এ রাজ্যে নবি দিবস পালন হয়। মমতা ব্যানার্জির প্রতিবাদ শোনা যায় না।

সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন, কোনো একটিও হিন্দু সুরক্ষার প্রশ্নে মমতা ব্যানার্জির স্লোগান, চিৎকার, রাজনৈতিক বার্তা, প্রশাসনিক সতর্কবাণী শোনা যায়নি। যতবার জামাতিদের, জঙ্গিদের কলকাতার গলিতে গুলশন কলোনিতে খোঁজা হয়েছে তখন কিন্তু মমতা ব্যানার্জির মুখে ধিক্কার শুনিনি। কেরলের এর্নাকুলামে যখন ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষে তুমুল স্রোত তখনও মমতা ব্যানার্জির আওয়াজ নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখন হিন্দুফোবিয়া-- যখন স্তালিন পুত্র উদয়ানিধি সনাতনধর্মকে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করে, তখনও মমতা চুপ। ভোটব্যাংকের খাতিরে তিনি আরও বেশি মাদ্রাসা তৈরির অর্থ দিলেন, মুসলমান ইমাম, মোয়াজ্জেমদের ভাতা বৃদ্ধি করলেন— এই পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যঞ্জন। কিন্তু কোন সাহসে তিনি বারবার হিন্দুদের আঘাত করেন! একইভাবে তো কখনো ইসলাম নিয়ে আবোল তাবোল বলতে শোনা যায় না। আবোল তাবোল বলার বেলাতেও তবে কি বাড়তি বোধ সঞ্চার হয়? সেই বোধের নাম ভোট ব্যালট জয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। তাঁর কথায় ভারত সেবাশ্রম নাকি 'দাঙ্গা' বাধায়। মমতার সেনা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীরা কি তবে মানবতার পূজা করছে? তিনি যে কতটা হিসেব রাখেন মুসলমান ভোটব্যাংকের তা হাতে নাতে ধরা পড়েছিল ২০২১ বিধানসভার প্রাক্কালে। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট এই রাজ্যে রাজনৈতিক মাঠে নামতেই তিনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে বলছেন— একটাও মুসলমান ভোট যেন ভাগ না হয়। অর্থাৎ তিনি জানেন তিনি টিকে আছেন কনসোলিডেটেড মুসলমান ভোটের জোরে। যেটাকে তিনি রাজনৈতিক, পৈতৃক সম্পত্তির মতো নিজের দখলে ভাবছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভোট রাজনীতিতে মুসলমান ভোটব্যাংক একটা ফ্যাক্টর; তাই হিন্দুদের আঘাত, অসম্মান করাটাও বড়ো ফ্যাক্টর। মমতা ব্যানার্জির হিন্দুফোবিয়া আনুপাতিক হারে মুসলমান ভোটব্যাংকের হিসেব রাখে। ২০২০ সালে রাজ্য সরকারের ষষ্ঠশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে অসম্মান করা, বিকৃত করা, সেখানে উল্লেখ ছিল 'রোমিং ও রাম শব্দের মিল', 'সংস্কৃত ভাষায় রাম শব্দের মিল', 'সংস্কৃত ভাষায় রাম শব্দের অর্থ হলো যিনি ঘুরে বেড়ান।'

পশ্চিমবঙ্গের ইসলামীকরণ যতভাবে করা যায়, ততভাবেই তিনি উদ্যত। তাই 'মৃত্যুকুম্ভ' বলাটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যে ভঙ্গিতে তিনি শ্রীরাম, কবি কৃত্তিবাসকে অস্বীকার করেন, ঠিক একই তালে তিনি মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেন। মমতা ব্যানার্জির মতো রাজনীতিক ভোট ব্যাংকের প্রবল তাড়নায় কালচারাল হেরিটেজের অপমৃত্যু ঘটায়। বিবিসি এমনকী আল জাজিরাও গত বছর জুনে হজ যাত্রার পর যখন রিপোর্ট করছে— মক্কায় বহু মানুষ মারা গেছে। গত বছর হজ করতে গিয়ে ১৩০১ জন হজযাত্রীর মৃত্যু হয়। অনুমোদন ছাড়াই কত মানুষ হজে অংশ নেন। প্রবল দাবদাহ। আর্থিক অব্যবস্থা। যে মৃত্যু নিয়ে সব দেশ এমনকী মিশর, ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সরব ছিল। তখন কেন মমতা ব্যানার্জি নিন্দে করলেন না?

সেবার হজযাত্রায় অংশ নিয়েছিল প্রায় ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার মুসলমান। তাতে ১০০০-এর ওপর মৃত্যু এবং তা শুধুমাত্র অব্যবস্থার জন্য। আর মহাকুম্ভে ৬৬ কোটির সমাগমে ভক্তদের অতি চঞ্চলতায় অতিরিক্ত পুণ্যের আশায় ৩০ জনের মৃত্যু। প্রথম ঘটনায় মমতা ব্যানার্জি মুসলমান ভোট পাছে কমে তাই চুপ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুসলমান ভোটে আরও একটু তৈলাক্তকরণে তিনি মৃত্যুকুম্ভ বললেন। তোষণ নীতিতে কোনো রাজনৈতিক পথে দীর্ঘ সময় চলে না, চলেনি। বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ রাজের পতন হয়েছে শুধুমাত্র ব্রিটিশদেরই নাৎসি তোষণের জন্য। মমতা ব্যানার্জি তোষণ রাজনীতিতে বৈতরণী পার হতে চাইছেন কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি অনবরত যে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করছেন তা সময়ের ঘরে, সময়ের পাতায় লেখা থাকছে। হিন্দুদের বেলায় বড্ডো বেশি সেকুলার হয়ে যান তিনি। হজে মৃত্যু কিংবা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বেলায় টুঁ শব্দ নেই। টুঁ শব্দ হলেই যে টুঁটি টিপবে মুসলমান ভোট। তাই এত দ্বিচারিতা। তাঁর এই রাজনৈতিক প্রণালীই তাঁর রাজনৈতিক ভাবভঙ্গির নিকৃষ্টতা প্রমাণ করছে— এর জবাব একদিন তাঁকে দিতেই হবে।

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ

অমৃতের স্পর্শ কমিউনিস্টরা কোনোদিন পাবেন না

ড. জিষ্ণু বসু

সিপিএমের বাংলা মুখপত্রে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভের সাফল্যের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারকে দায়ী করেছে। বর্তমান সহস্রাব্দে এই মহাকুম্ভই প্রথম। তাই এই ধরনের মন্তব্য সমগ্র হিন্দু সমাজের অপমান। অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোনো মজহবি যাত্রা বা রিলিজিয়াস কর্মকাণ্ডের বিষয়ে এমন কোনো স্পর্ধা দেখাতে তারা পারবেন না। হজের বিষয়ে এমন কোনো কটু কথা বললে তাঁদের সম্মেলন ময়দানে কেবল পোড়া বাঁশ আর ছেঁড়া কাপড় ছড়িয়ে থাকতো। হিন্দুদের সহনশীলতার সুযোগ এইসব দল সবসময়ই নিয়ে থাকে। কিন্তু এই অদ্ভুত বিশ্লেষণ অনেকগুলি দিককে উন্মোচন করেছে।

প্রথমত, তারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে চেনেনই না। আজ থেকে ১৪৪ বছর আগে মহাকুম্ভে ৩ কোটি মানুষের সমাগম হয়েছিল। তখন ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল ২২ কোটি ৪০ লক্ষের মতো। তাই হিন্দুধর্মের টান সে যুগেও ছিল, আজকেও আছে, আজ থেকে ১৪৪ বছর পরেও থাকবে। তাই বিদেশি আক্রমণে যখন মিশর, পারস্য বা দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, ভারতে হাজার বছর আগেও হিন্দুরা কুম্ভে পুণ্যস্নান করতে গেছেন, আজও যাচ্ছেন, আগামী দিনেও যাবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, '...ওই বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন— এদেশে চিরকাল।' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝতে এই ভারতের কমিউনিস্টদের ১০০ বছর লেগেছে, ভারতবর্ষ আর হিন্দুধর্ম বুঝতে হয়তো আরও ১৪৪ বছর লাগবে, যদি আরও ১৪৪ বছর পরে পৃথিবীতে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো অস্তিত্ব থাকে। কারণ গত ১০০ বছরে কমিউনিজমের নামে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানে ১০ কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। রাশিয়া, চীন বা কম্বোডিয়ায় ভয়াবহ গণহত্যার মতো পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হয়েছে এই বিশ্ব। ২১৬৯ সালে যখন প্রয়াগে আবার মহাকুম্ভ হবে তখনও হিন্দুদের ভিড়ে এভাবেই সঙ্গমের মাঘমেলার চর উপচে পড়বে। সেদিন হয়তো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সবকটি দলই হয়তো কেবল শিশুপাঠ্য পুস্তকেই থাকবে। আর একটা বিষয় অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে। সেটা হলো ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকের মনোভাব আর বিদেশি ভাবনায় সম্পৃক্ত দলের দৃষ্টিভঙ্গি। সেবারও ইংরেজ সরকার খুব চড়া হারে কুম্ভে তীর্থকর বসিয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য হিসেবে জনপ্রতি ১ টাকা তীর্থকর দিয়ে হিন্দুদের প্রয়াগে আসতে হয়েছিল। কিন্তু ওই করের টাকা দিয়ে কী করা হয়েছিল? ইংরেজ আধিকারিক ড. প্ল্যাঙ্ক মেলার প্রায় শেষে বলেছেন, কলেরা আর জ্বর নিয়েও হিন্দুরা স্নান করছে। পয়ঃপ্রণালী বা শৌচাগার, কিছুই নেই। তবে হিন্দুরা কর দিয়েছিলেন কেন?

ইংরেজ শাসক মেলার কেবল খারাপটাই দেখেছে। নাগা সাধুরা পুরুষ মহিলার সামনে বস্ত্রছাড়া ঘুরছেন। খুব ধনী রাজা মহারাজারা তাঁদের হাতি, ঘোড়া, সোনা, ধনরত্ন দিয়ে ভরিয়ে দেন। ১৪৪ বছর পরেও এই মানসিকতা পরিবর্তিত হয়নি। নাগা সাধুরা বস্ত্র

পরিধান করতে জানেন না বা বস্ত্র জোগাড় করতে পারেন না বলে কাপড় পরেন না, তা তো নয়। তাঁরা আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন, সেখানে বস্ত্র বা বস্ত্রহীন হওয়ায় কিছু যায় আসে না। কিন্তু ভারতীয়রা যখন আবিষ্কার করেছিলেন যে ১৪৪ বছর পর পৃথিবী, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহ একই সরলরেখায় আসে, সেই সময় কার্ল মার্কসের জন্মস্থান জার্মানি-সহ ইউরোপের বহু অংশের মানুষ বস্ত্র পরিধান করতেই জানতেন না। সে যুগে ভারতবর্ষে ঋষি মুনিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে বৃহস্পতি গ্রহের একটিবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর হিসেবে বারোটা বছর লাগে। তাঁরা খালি চোখে আবিষ্কার করেছিলেন কোনো গ্রহের গতিপথ আর তিথি নক্ষত্র সবকিছু ঠিকঠাক বলতে পারতেন।

ইসলামি শাসনকালে প্রায় চারশো বছর কুম্ভমেলা প্রয়াগে হয়নি। হাজার হাজার বছরের পুরাতন তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগরাজের নাম পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছিল আল্লাহবাদ বা এলাহাবাদ। কিন্তু ভারতের চারটি স্থানে ঠিক ঠিক তিথিতে পালিত হয়েছে অর্ধকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভ বা মহাকুম্ভ। বিদেশি শাসকের অত্যাচার সহ্য করেও সুযোগ পেলেই নাসিকে, উজ্জয়িনী বা হরিদ্বারে বসেছে কুম্ভমেলা। ১৯২৫ সালে জন্ম হওয়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চক্রান্তে এই সব হয়েছিল? ১৪৪ বছর আগে ইংরেজদের

নজর গিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ মস্তক মুণ্ডন করছেন। ইংরেজ সাংবাদিক লিখেছেন, নদীর ধারে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত স্তূপাকৃতি চুল রয়েছে। সরকার বাহাদুর নিলাম করে করে ঠিকেদার লাগিয়ে সেই কেশরাশি রপ্তানিও করেছে। সেবছর রেলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিট সংখ্যার অনেক অনেক বেশি মানুষ অকাতরে এলাহাবাদ স্টেশনে নেমেছেন, তীর্থ সেরে ফিরে গেছেন কিন্তু তার থেকে বহুগুণ বেশি পুণ্যার্থী হেঁটে এসেছিলেন। ১০০ মাইল দূর থেকে বহু মানুষ হেঁটে এসেছিলেন।

আজ ১৪৪ বছর পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৌচাগারের প্রতুলতা সারা পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দিয়েছে। 'এক থলি আর এক থালা' এই আহ্বান কোটি কোটি সাধারণ তীর্থযাত্রীকে দিয়ে অসাধারণ কাজ করিয়েছে। নিজের আবর্জনা থলিতে রেখে যথাস্থানে ফেল আর নিজের স্টিলের থালায় খাবার খেয়ে ধুয়ে মুছে নিজের ব্যাগে রেখে দাও। কোথাও কোনো আখড়ায় ভাণ্ডারা দিলে সেখানের স্টিলের থালায় খেয়ে থালা ধুয়ে রেখে দাও। বালির উপরে স্টিলের পাত পেতে রাস্তা তৈরি হয়েছে।

সমুদ্রের তলায় বহু দূরে বাঁধ দিলে সুনামির ক্ষতি আটকানো যেত। কিন্তু সেই বাঁধ দেওয়া সম্ভব কি? পয়ষট্টি কোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা পৃথিবীর কারোর নেই। মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের, কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি আরও বেদনার।

মৌনী অমাবস্যার আগের দিন ঐরাবত ঘাটে স্নান করে ওঠার পরেই দেখলাম, শীতের মিষ্টি রোদে কিছু পুরুষ ও মহিলা বালিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। কয়েকজন একেবারে চাঁদোয়া মতো কিছু টাঙিয়ে তার নীচে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। দেখে আমারও মনে হলো তাঁদের ঘাটের ধার থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

সেদিন আমার তাড়া ছিল। ঝুসি যাওয়ার রাস্তায় একটা বিশাল জনস্রোতকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করার সময় আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। জনস্রোত আমাকে প্রায় মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে ফেলেছিল। পদপিষ্ট হওয়ার আগের মুহূর্তে। দেখলাম একজন মানুষের ইচ্ছা বা নিয়ন্ত্রণে এটা থাকে না। জনস্রোতের গতিজাড্য বা ভরবেগের কাছে ভিড় থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টার বিশেষ দাম নেই। মেলায় বিশেষত, স্নানের ঘাটে সকলকে সবসময় জাগ্রত আর সজাগ রাখতে হবে। হয়তো পুলিশ করুণাবশতই ওই গরিব মানুষগুলিকে ঘুম থেকে তুলে সরিয়ে দেয়নি।

কিন্তু এই সামান্য ভুলে মানুষগুলির জীবন

চলে গেল। এই বিপদ যাতে না ঘটে তার জন্য উন্নত ব্যবস্থা ছিল। হেলিকপ্টার থেকে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, ড্রোন ছিল, ওয়াকিটকি ছিল, প্রশিক্ষিত বাহিনী ছিল। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নদীর উপরে লোহার পিপা দিয়ে তৈরি সবপুলই সাধারণের জন্য বন্ধ ছিল। পিপাপুল কেবল সাধুদের জন্যই কিছু সময়ের জন্য খোলা হয়েছিল। এই নিদারুণ বেদনার ঘটনায় গত ২৯ জানুয়ারি কুম্ভমেলায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। সব তীর্থযাত্রী মনে করছিলেন তাঁদেরই কোনো আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে । হাজার হাজার মানুষেরও একটা সমবেত দুঃখ, সমবেদনা থাকে সেটা মৌনী অমাবস্যার সন্ধ্যায় উপস্থিত না থাকলে অনুভব হতো না।

মেলা প্রায় শেষ। সেক্টর আট বা অন্য দূরের সেক্টরগুলিতে তাঁবু খোলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গম স্নানে লোকজন কমেনি। একদিন সকালে দেখি এক হাট্টাকাট্টা যুবক একটা বাঁকে দুদিকে দুটো আমগাছের চারা নিয়ে স্নান করতে নামছে। খুব কৌতূহল হলো। যুবকটির নাম সত্যেন্দ্র মিশ্র, বাড়ি প্রতাপগড়। কিছু আমগাছের চারা স্নান করাচ্ছেন কেন? সতেন্দ্র মিশ্রের সরল উত্তর, 'তুমি স্নান করেছো কেন? অমৃতের ভাগ পাবে বলে তো? তা তুমি কতদিন বাঁচবে? ২০ বছর, ৩০ বছর ৫০ বছরের বেশি তো নয়। এই আমগাছ আজ অমৃত নিয়ে গেল। এই গাছ আমার ছেলেকে অমৃত দেবে, আমার নাতিকে অমৃত দেবে, আমার প্রপৌত্রকে অমৃত দেবে।'

জীবনে পরিবেশ সংরক্ষণের অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য শুনেছি। কিন্তু সতেন্দ্র মিশ্রের মতো সরল সহজভাবে বাস্তব সত্যটা আর কারও কাছে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

মেলায় একটি মেয়েকে ক'দিন ধরে দেখছি। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আলাপ হয়নি। সেদিন সন্ধ্যায় কী মনে হলো সঙ্গমে ফুল প্রদীপ ভাসাবো। অবশ্য জল যাতে দূষিত না হয় তাই স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রদীপের ডোঙ্গা জল থেকে তুলে ফেলে দিচ্ছে। আমি বছর দশেকের মেয়েটির থেকে ডোঙ্গা কিনে দেখি তাতে প্রদীপ নেই।

'কীরে প্রদীপ নেই কেন?'

'দিয়া নেহি হ্যায় মেরে পাস।'

সরল চোখে তাকিয়ে টাকা ফেরত দিচ্ছিল। আমি পাশের মেয়েটিকে বললাম, একটা প্রদীপ দিতে। ও তর্ক জুড়ল, 'তুমি ফুল কিনবে ওর থেকে, আর আমি কেন প্রদীপ দেব?'

যাইহোক, প্রদীপ ভাসিয়ে মেয়েটির পাশে বসলাম। জলে আর বালিতে মাঘমেলার মাঠ আলোয় স্নান করছে। এ মেয়েটিরও বয়স বারো বা তেরো। নাম রীতা, রীতা হেলা।

'তোর রোজ কত টাকার ফুল বিক্রি হয়?'

'কেন বলব তোমাকে?'

'স্কুলে যাস না?'

'যাই তো, ক্লাস সিক্সে পড়ি।'

ধীরে ধীরে অনুভব করলাম, আমার নিজের বাড়ির মেয়ের মতো এই একরত্তি রীতা হেলা আমার রক্ত, আমার আত্মীয়। ১৪৪ বছর আসে আমার মতো অর্ধেক জীবন পার হওয়া একজনের সঙ্গে এমন একরত্তি রীতা হেলার ভাব হয়েছিল সেদিন, এত আলো ছিল না, হয়তো গুটিকয় প্রদীপ ছিল।

বিশাল মেলার একেবারে শেষের দু'কথা না বললে নয়। শিক্ষা উত্থান ন্যাসের মতো সংস্থা জ্ঞানকুম্ভের আয়োজন করেছিল, তেমন ভারত সরকারের মন্ত্রক আয়োজন করেছিল, ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রক সাজিয়েছিল 'কলাগ্রাম'। কখনো-বা কোনো আখড়ায় সাধ্বী মাতাজীরা ইয়া বড়ো বড়ো পিলসুজে প্রদীপ নিয়ে সন্ধ্যায় গঙ্গাআরতি করছেন। ভক্তি আর বীররস মিলিমিশে একাকার হয়ে গেছে। যে মানুষটা আমার গায়ে লেপটে দাঁড়িয়ে আছে সে ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়, শূদ্র না বনবাসী? কখোনো মনে আসেনি সেকি বাঙ্গালি, বিহারী, মারাঠি , মাদ্রাজি না গুজরাটি? কে জানে? কিন্তু দুজনে একসঙ্গে আনন্দে উত্তেজনায় জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছি— 'হর হর গঙ্গে'। কিংবা হঠাৎ পাওয়া ভাণ্ডারার ক্ষীরের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে বলছে, 'ভাইজী' আপকে লিয়ে.... আরে দাদা লিজিয়ে তো।'

মেলা প্রায় শেষ। শিবচতুদর্শীর স্নানও শেষ। মেলায় সাজানো হাজারো পসরা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েকদিন যে মানুষটির সঙ্গে একেবারে সেটে ছিলাম, ব্রজেশ নিষাদ, আমার বাইকার। প্রতিদিন তো আর ১৫/২০ কিলোমিটার হাঁটা যায় না। সেক্টরে সেক্টরে চষে বেড়াতে হলে বাইক। ব্রজেশ অন্য সময় জোমেটোর খাবার ডেলিভারি করে। গত দেড় মাস গড়ে সে তার দশগুণ আয় করেছে। আজ কী মনে হলো ও নিজেই বলল, 'চলুন আজ দুই ভাই একসঙ্গে ত্রিবেণী স্নান করি।'

আমারও কী মনে হলো, 'ঠিক আছে, তবে আজ বোটে করে একেবারে সঙ্গমে স্নান করব দুই ভাই।' ব্রজেশ একটু ইতস্তত করে বলল, 'দুজনে তো অনেক খরচ হবে !'

বোটক্লাবে গেলাম স্পিড বোট ধরতে। পাশেই উঁচু হেলিপ্যাড থেকে একটা চপার উড়ে গেল। ১৪৪ বছর আগে এখানে কি ছিল! আচ্ছা, দাঁড়টানা নৌকা তো পাওয়া যায়। খুঁজে পেলাম একটি নৌকা— ছিপখান দুই দাড়, দুইজন মাল্লা। দুজনেরই বয়স সত্তরের কাছে। নৌকায় গদির উপর সাদা ধবধবে চাদর পাতা। পাশে সাদা বালিশের সারি। উপরে ছাউনি। দুই বুড়ো রুটি আর আলু মটরের সবজি নিয়ে সবে খাওয়া শুরু করেছে। রুটিতে যেন একটু ঘি মাখানো! খাওয়া হলো,জল খেয়ে দাঁড়ে টান পড়ল। যমুনা বেয়ে পানসি চলেছে গঙ্গার দিকে।

আমার বসে বসে মনে হচ্ছিল, কমিউনিস্টরা হাজার চেষ্টা করলেও এই অমৃতের সন্ধান কোনোদিন পাবে না। ■

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান অনুষ্ঠান

গত ২ মার্চ শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে কলকাতা-স্থিত রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত হয় '৩৯তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দান করেন বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বাজাজ। সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ ও বরিষ্ঠ সাংবাদিক বলবীর পুঞ্জ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী সজ্জন ভজনকা, আয়কর সংক্রান্ত পরামর্শদাতা সজ্জন কুমার তুলসীয়ান। অনুষ্ঠানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজকে ২০২৫ সালের বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত করা হয়। খুশবু বাজাজ ও সুদীপ্তী রায় মহারাজের কপালে তিলক অঙ্কন করেন। সনাতনী সংস্কৃতি রক্ষায় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ যোদ্ধা, সেবাকাজে সমর্পিতপ্রাণ সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজকে সম্মাননা স্বরূপ এক লক্ষ টাকার চেক এবং মানপত্র প্রদান করা হয়। মহারাজকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন সঞ্জয় শেঠ, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বলবীর পুঞ্জ, সজ্জন ভজনকা ও সজ্জন তুলসীয়ান। সজ্জন ভজনকা আগামীদিনে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন। তাঁকে শাল ও উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের মালা পরিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, মোহনলাল পারীক, অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, নন্দকুমার লঢা ও ভগীরথ চণ্ডক। স্বস্তি বাচন পাঠ করেন অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। অসমের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, ভারতের মূল ভিত্তি হলো তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা। হিন্দু ও সনাতন সংস্কৃতি যতদিন সজীব থাকবে, ভারতীয় গণতন্ত্র ততদিন সুরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের গৌরব হলেন পূজনীয় স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। হিন্দুধর্ম রক্ষায় সদা তৎপর এবং সেবাকাজে মহীয়ান মহারাজ বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি। অনুষ্ঠানের সভাপতি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ বলেন যে, আজকের ভারত এক নতুন ভারত। এই ভারত আপোশহীন ও ভয়ডরহীন। ভারতমাতার জয়ধ্বনি শুধুমাত্র একটি স্লোগান নয়, নতুন ভারতের আবির্ভাবের সংকেত। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করে চলেছে আজকের বিকশিত ভারত। তিনি স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজকে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান প্রদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করার জন্য সংস্থার চয়ন সমিতিকে ধন্যবাদ জানান। বিবেকানন্দ সেবা সম্মান গ্রহণ করে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ বলেন যে, আমি এই সমাজের একজন সেবক মাত্র। আমাদের কাজ সমাজের মেলবন্ধন, সামাজিক ঐক্যসাধন, সমাজের বিভাজন নয়। ধর্ম ও কর্মকে পরস্পরের পরিপূরক আখ্যা দিয়ে বনবাসী, জনজাতি সমাজকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা না করে তাঁদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন মহারাজ। কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি এই সম্মান গ্রহণ করছেন বলে জানিয়ে মহারাজ বলেন যে, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার লক্ষ্যে তিনি আজীবন তাঁর প্রয়াস জারি রাখবেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা, প্রবীণ সাংবাদিক বলবীর পুঞ্জ তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, ভারতের সাধুসন্তরাই ধর্ম ও রাষ্ট্ররক্ষার সেনানায়ক। সেই পরম্পরার সুযোগ্য ধারক ও বাহক স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ হলেন একজন নির্ভীক সৈনিক। গণতন্ত্র, মানবিক মূল্যবোধ এবং হিন্দুধর্ম রক্ষায় তাঁর মতো একজন যোদ্ধা সন্ন্যাসী নিরন্তর সংগ্রামরত। ভারতীয়দের সব সংস্কারের মধ্যে সনাতনের সর্বব্যাপী উপস্থিতি। তাই ভারতীয়দের জন্য শস্ত্র ও শাস্ত্র— দুই-ই আবশ্যক। এক দেশ, এক সংস্কৃতির ভারতীয় ঐতিহ্যকে ধ্বংসের লক্ষ্যে সক্রিয় ভারত বিভাজনকারী শক্তির যাবতীয় অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রশাসনিক দক্ষতার বিষয়টি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন বিশিষ্ট শিল্পপতি সজ্জন ভজনকা। পূজনীয়

মহারাজের সেবাকাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন বিশিষ্ট আয়কর উপদেষ্টা সজ্জন কুমার তুলসীয়ান।

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সাহিত্য সচিব ড. তারা দুগড়। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের সচিব বংশীধর শর্মা। কলকাতা ও হাওড়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অজয় নন্দী, সাগরমল গুপ্তা, বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ সিংহ, মহাবীর প্রসাদ সরাওগী, রতন জৈন, সুশীল রায়, তাপস রায়, তমোঘ্ন ঘোষ, অনিল ওঝা নীরদ, ড. অরুণ উপাধ্যায়, মহেন্দ্র আগরওয়াল, বালকিষণ লুণ্ডিয়া, অজয় চৌবে, ড. কমল কুমার, প্রদীপ সূঠওয়াল, প্রভুদয়াল পারীক, চম্পালাল পারীক, ওঙ্কারনাথ সিংহ, নবীন সিংহ, যশবন্ত সিংহ, অজয় মিশ্র, শঙ্করবক্স সিংহ, ব্রহ্মানন্দ বংগ, কিষণ ঝাওয়ার, কমল গুপ্তা, পবন ধেলিয়া, মীনাদেবী পুরোহিত, দয়াশঙ্কর মিশ্র, ড. মহেশ মাহেশ্বরী, সঞ্জয় রস্তোগী, মনোজ পরাশর, ঘনশ্যাম চৌরসিয়া, রামচন্দ্র আগরওয়াল, মহেশ মোদী, রামপুকার সিংহ, শ্রীমোহন তেওয়ারী, রাজেন্দ্র কানুনগো, রামানন্দ রস্তোগী, বুলাকীদাস মীমাণী, পূর্ণেন্দু দে, মহেন্দ্র শর্মা, রমাকান্ত সিনহা, মদনলাল বোথরা, সুনীল হর্ষ, রবিপ্রতাপ সিংহ, তেজবাহাদুর সিংহ, বৃজেন্দ্র প্যাটেল, গায়ত্রী বাজাজ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন সত্যপ্রকাশ রায়, মনীষ জৈন, ভগীরথ সারস্বত, চন্দ্রকুমার জৈন, দুর্গেশ ত্রিপাঠী ও অরুণ সিংহ।

স্বামীজী নেতাজী সংস্কৃতি পরিষদের রক্তদান শিবির

উত্তর দমদম নগরের স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত 'স্বামীজী নেতাজী সংস্কৃতি পরিষদ'-এর উদ্যোগে , 'রবীন্দ্রপল্লী উন্নয়ন সমিতি'র সহযোগিতায় এবং মানিকতলা ব্লাডব্যাংকের তত্ত্বাবধানে গত ২ মার্চ একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সমাজকে যুক্ত করে এই সামাজিক সমরসতার কর্মযজ্ঞে এক অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। মোট ৪১ জন রক্তদান করেন। পদ্মশ্রী ডাঃ জগদীশ হালদার, বরিষ্ঠ আইনজীবী শুভেন্দু মিত্র (মানসদা), অল ইন্ডিয়া ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য রবীন্দ্র দত্ত, শিখা দেববর্মণ এবং সঙ্ঘের জেলা তথা নগর কার্যকর্তাদের উপস্থিতি কার্যক্রমটিকে গৌরবান্বিত করে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের শতাধিক স্বয়ংসেবক ও মাতৃমণ্ডলী।

আরোগ্য ভারতী এবং ক্যালকাটা রাউন্ড ফোরের উদ্যোগে সুন্দরবনে সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠান

গত ৩ মার্চ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা-স্থিত পাটঘরা, যোগেশগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, যোগেশগঞ্জ, হেমনগর ইত্যাদি আইলা ঝড় বিধ্বস্ত এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ১৫টি গ্রাম থেকে ১৫ দম্পতির সামূহিক সামাজিক বিবাহ। হিন্দুসমাজের ষোড়শ সংস্কৃতির অন্যতম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হলো বিবাহ। আরোগ্য ভারতী ও ক্যালকাটা রাউন্ড টেবিল ফোরের যৌথ উদ্যোগে এবং যোগেশগঞ্জের জয়দেব মিস্ত্রি-সহ স্থানীয় কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী সাড়ম্বরে, ১০০০ জন অতিথির উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় সামূহিক বিবাহের এই শুভ সামাজিক অনুষ্ঠান। বরযাত্রী ও কনেযাত্রী, স্থানীয় মানুষ, ক্যালকাটা রাউন্ড টেবিল ফোরের সদস্য-সদস্যা, রাজেশ কর্মকার, আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র দাস, আরোগ্য ভারতী ও দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক দম্পতিকে দাম্পত্য জীবন শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী— খাট, ম্যাট্রেস, শোকেস, আলমারি, সেলাই মেশিন, বাসনপত্র, নাকের নথ ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়। অতিথিদের রসনা তৃপ্তির জন্য ফুচকা স্টল, কফি স্টল ও অন্যান্য স্টল ছিল। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে গোশালা দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রামে প্রথম এই ধরনের অনুষ্ঠান দেখে স্থানীয় গ্রামবাসীরা হন আনন্দে আপ্লুত ও উচ্ছ্বসিত।

প্রত্যেক দম্পতির নতুন জীবন খুশিতে অতিবাহিত হোক— এই কামনা তাঁরা করেন। আগামীদিনে এই ধরনের অনুষ্ঠান আরও হোক সেই আশাও তাঁরা প্রকাশ করেন।

আধুনিক ভারতের নির্মাতা ডাক্তারজী

সোমকান্তি দাস

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠাতা কে তা হয়তো অধিকাংশ লোকই বলতে পারবে না। ছবি দেখেও চিনতে পারে এমন মানুষের সংখ্যাও নগণ্য। যে কোনো সংগঠনের নামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতার নাম ও তার ছবি সম্পৃক্ত হয়ে থাকতেই দেখা যায়। ব্যতিক্রম একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেই। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন ডাঃ কেশবরাও বলিরাম হেডগেওয়ার। তবে কখনো নিজেকে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করতেন না, সঙ্ঘ আরম্ভ হওয়ার দিন তিনি বলেন, আজ থেকে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হলো। সঙ্ঘকে তিনি সমাজের মধ্যে একটা সংগঠন হিসেবে উপস্থাপন না করে, সমগ্র সমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে সঙ্ঘ স্থাপনা করেন।

১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর পবিত্র দিনে নাগপুরের মহাল-স্থিত ডাক্তারজীর বাড়িতে বিশ্বনাথরাও কেলকর, ভাউজী কাওরে, ডাঃ লক্ষ্মণ বাসুদেব পরাঞ্জপে, রঘুনাথরাও বাপ্তে, ভাইয়াজী দাণী, বাপু ভেদী, আন্না বৈদ্য, কৃষ্ণরাও মোহরীল, নরহর পালেকর, দাদারাও পরমার্থ, আন্নাজী গায়কওয়াড়, দেওঘরে, বাবুরাও তেলঙ্গ, তাত্যা তেলঙ্গ, বালাসাহেব আঠল্যে, বালাজী হুদ্দার ও আন্না সোহোনী এই ১৭ জন একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে সঙ্ঘের স্থাপনা করেন। কিন্তু সঙ্ঘের কাজ কী, কোন পদ্ধতিতে কাজ চলবে, সঙ্ঘের নাম কী হবে, সঙ্ঘের গুরু কে হবেন? এর কোনো কিছুই সেদিন নিশ্চিত হয়নি। সামনে একটাই মাত্র ধ্যেয়— হিন্দু সংগঠন। সকলের সার্বিক মতামতের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত সংগঠনের ধ্যেয়কে রূপ প্রদান করতে থাকে। স্বয়ংসেবকদের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যা, বাধা, ভালো-মন্দ অভিজ্ঞতা বৈঠকে আলোচনা হতে থাকে, তার থেকেই সঙ্ঘের মধ্যে একেক বিষয় যুক্ত

হতে থাকে। ডাক্তারজী কেবলমাত্র তাঁর মনের ইচ্ছাকে স্বয়ংসেবকদের ভাবনাতে নিয়ে আসেন, স্বয়ংসেবকদের ওপর কখনো তা চাপিয়ে দেননি।

সঙ্ঘ শুরুর পর স্বয়ংসেবকেরা আখাড়াতে গিয়ে শারীরিক কসরত করতে শুরু করে, কিন্তু সেখান থেকে নিজস্ব জায়গায় সঙ্ঘের কার্যক্রম চালানোর উদ্দেশ্যে মোহিতেওয়াড়াতে নিত্যশাখা শুরু হয়। ভগ্ন রাজবাড়ির একটা অংশ বেছে নিয়ে ডাক্তারজী নিজেই ভাঙা ইট-পাথর সরিয়ে সঙ্ঘস্থান গড়ে তোলেন, ডাক্তারজীকে কাজ করতে দেখে বাকি স্বয়ংসেবকরাও হাত লাগায়। ছোটো ছোটো কাজের মধ্যে দিয়ে সংস্কার নির্মাণের কাজ চলতে শুরু করে।

একবার স্বয়ংসেবকেরা সিনেমা দেখতে যায়, সেদিন ডাক্তারজী একা সঙ্ঘস্থানে ছিলেন। পরে প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করলে কাকতালীয়ভাবে সকলেই মাসির বাড়ি গেছিল বলে জানায়। ডাক্তারজী কারও উপর রাগ না দেখিয়ে শাখাতে গল্পের ছলে বলেন, গতকাল কি মাসি দিবস ছিল? একই অজুহাতের কারণে সকলে ধরা পড়ে যায়। তিনি বলেন, তোমরা বললে আমিও সিনেমা দেখতে যেতাম। এরপর স্বয়ংসেবকেরা সকলে মিলে সিনেমা দেখার জন্য দিন ঠিক করে। সেদিন রবিবারে ডাক্তারজী সকলকে নিয়ে গল্পে এমন মশগুল হয়ে যান যে, সিনেমার সময়ই পেরিয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে সকলে বাড়ি যেতে চাইলে তিনি সকলকে নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে ইন্ডিয়ান জিমখানার সামনে মাঠে বসে সিনেমার টিকিটের জন্য রাখা টাকা দিয়ে মিষ্টান্ন কিনে গল্পের আসর বসে। সকলে অনুভব করে সিনেমার চেয়েও বেশি আনন্দের কিছু হতে পারে। রবিবারে নিত্যশাখার পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়।

সঙ্ঘ শুরুর প্রায় মাসছয়েক পরে সঙ্ঘের নামকরণ হয়। বালক কিশোর স্বয়ংসেবকেরা বিভিন্ন নামের প্রস্তাব দেয়, তারপর প্রত্যেকটি নাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামটি সর্বসম্মতিতে ঘোষণা হয়।

রাষ্ট্রবোধ জাগরণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবকে সঙ্ঘে স্থান দেওয়া হয়। চৈত্র শুক্ল প্রতিপদে হিন্দু নববর্ষকেও বর্ষ প্রতিপদ উৎসব রূপে গ্রহণ করা হয়। ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণে রাখতে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশীতে হিন্দু সাম্রাজ্য দিন উৎসব। সঙ্ঘ শুরুর পরে সংগঠনের কাজ বছরখানেক বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে চালানো হতো। কিন্তু তা স্বয়ংসেবকদের আত্মসম্মানে লাগে। সঙ্ঘের কাজ নিজস্ব কাজ, তাই এই কাজের জন্য কারও কাছে হাত না পেতে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ দিয়েই সঙ্ঘকাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার জন্য ভারতের প্রাচীন পরম্পরা শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব শুরু হয়। মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গৈরিক ধ্বজ

উত্তোলন করা হতো। ডাক্তারজী সেই গৈরিক পতাকাকেই গুরু হিসেবে বর্ণনা করেন এবং পূজন করেন। সেদিন থেকে পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করা হয়, গুরুদক্ষিণার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে স্বয়ংসেবকেরা সঙ্ঘকাজ চালাতে থাকে।

তেমনি বঙ্গভঙ্গ রোধে একতার প্রতীক রূপে রাখীবন্ধনের গুরুত্ব স্মরণে রাখতে রাখীবন্ধন উৎসব, অশুভের উপর শুভশক্তির বিজয়ের দিন তথা সঙ্ঘ স্থাপনা দিবস রূপে বিজয়া দশমী উৎসব এবং ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত দিন মকর সংক্রান্তি উৎসবকে সঙ্ঘে নৈমিত্তিক কার্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়। সবগুলোই নির্ধারিত হয় স্বয়ংসেবকদের সার্বিক মতামতের ভিত্তিতে।

ডাক্তারজী চাইতেন স্বয়ংসেবকেরা যেন সদ্গুণযুক্ত হয়। বিভিন্নভাবে তার চেষ্টা করে যেতেন। সঙ্ঘে সেসময় মরাঠি ও হিন্দির দোহাকে প্রার্থনা রূপে গাওয়া হতো। সমর্থগুরু স্বামী রামদাসের 'হে গুরু শ্রী রামদূতা শীল হামকো দীজিয়ে...' এই প্রসিদ্ধ দোহাটি প্রার্থনাতে সম্মিলিত ছিল। ডাক্তারজী এর মধ্যে একটি বাক্য, 'শীঘ্র সারে দুর্গুণো সে মুক্ত হামকো কীজিয়ে'— এইটিকে সঙ্ঘের প্রার্থনার মধ্যে পরিবর্তন করে ব্যবহার করেন। তিনি বলেন স্বয়ংসেবকদের দুর্গুণমুক্ত করার চেষ্টা না করে সদ্গুণ নির্মাণ করলে আপনা থেকেই দুর্গুণমুক্ত হয়ে যাবে। তাই বাক্যটি পরিবর্তন করে লেখেন শীঘ্র সারে সদ্গুণো সে পূর্ণ হিন্দু কীজিয়ে।

ডাক্তারজীর চরিত্র যেমন শুদ্ধ ছিল তেমনটি স্বয়ংসেবকদের মধ্যেও দেখতে চাইতেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে থাকাকালীন একবার নির্বাচনে এক প্রার্থীর হয়ে ডাক্তারজী জনসভায় ভাষণ দেন। উভয় পক্ষের জনসভাতে প্রবল একে অপরের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষিত হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ থেকে বহু চেষ্টার পরেও ডাক্তারজীর নামে অপবাদ দেবে এমন কোনো তথ্য খুঁজে পায়নি।

ডাক্তারজীর ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যে একবার কোনো বন্ধুর জন্য তিনি টাকা ধার করার জন্য তাঁর কাজের প্রবল বিরোধী এক উকিলের কাছেই যান। সেই উকিল মতানৈক্য থাকলেও নির্দ্বিধায় টাকা ধার দেন, পরিবর্তে ডাক্তারজী প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করে দিতে চাইলে তিনি জানান, প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করানোর কথা নাগপুরের লোক শুনলে তাঁকে সবাই ধিক্কার জানাবে।

এমনই বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ডাক্তারজী। তাঁর এই অসামান্য চরিত্রের উদাহরণ শৈশবকাল থেকেই পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। কেবলমাত্র শুদ্ধ চরিত্র নয়, তার সঙ্গে সাহস, বুদ্ধিমত্তা, শক্তি-সামর্থ প্রবল ছিল। আরেকটি অন্যতম গুণ যেটি তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট হিসেবে পরিগণিত হয় তা হলো প্রখর দেশভক্তি।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে তাঁর জন্ম। দিনটা ছিল ১৮৮৯ সালের ১ এপ্রিল, বর্ষ প্রতিপদ তিথি। শৈশবকাল থেকেই ইংরেজদের অত্যাচারের ঘটনা শিশু মনে দাগ কাটে। তাই কখনো শৈশবের শিক্ষক অয়াঝে গুরুজীর বাড়িতে ঘরের মেঝে খুঁড়ে সীতাবর্ডি দুর্গ পর্যন্ত সুরঙ্গ পথে গিয়ে ইংরেজদের ইউনিয়ন জ্যাক নামানোর চেষ্টা করা বা কখনো রানি ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের বর্ষপূর্তিতে বিদ্যালয়ে বিতরণ করা মিষ্টিকে ফেলা দেওয়া। এমন বহু উদাহরণ দেখতে পাই।

তাঁর বাল্যকালেই মহামারির সময়ে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে একই দিনে পিতা বলিরাম পন্ত হেডগেওয়ার ও মাতা রেবতীবাঈ পরলোক গমন করেন। বাড়িতে চরম দুর্বিষহ অবস্থা দেখা দেয়, তা সত্ত্বেও বালক কেশবকে দেশের জন্য কখনো আপোশ করতে দেখা যায়নি। যে সময় সারাদেশে বন্দেমাতরম বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার, সে সময় স্কুলের সমস্ত ছাত্রকে দিয়ে স্কুলের ইংরেজ পরিদর্শককে বন্দে মাতরম ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানোর পরিকল্পনা করে বালক কেশব এবং সফলও হন। পরিদর্শকের ক্ষোভের মুখে পড়ে বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কোনো ছাত্রই এই ঘটনার জন্য কেশবের নাম বলেনি। কিন্তু শিক্ষক, অভিভাবকরা অনেক চেষ্টায়, শর্ত সাপেক্ষে বিদ্যালয় চালু করতে সমর্থ হন। সরকারি আধিকারিক সমস্ত ছাত্রকে অপরাধ করার জন্য মাথা নীচু করে আসার নির্দেশ দেয়। বন্দে মাতরম ধ্বনি দিতে গর্ব অনুভব করা কেশব কীভাবে মাথা নিচু করে আসতে পারে? ধরা পড়ে যায়। ফলস্বরূপ নীলসিটি হাইস্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হয়। সে সময় ডাঃ মুঞ্জে-সহ কয়েকজন দেশভক্ত ব্যক্তির সহযোগিতায় যবতমাল বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

দেশ জুড়ে তখন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম ও অহিংস আন্দোলন চলছে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের পীঠস্থান তখন কলকাতা। তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই ডাক্তারি পড়ার জন্য কলকাতা চলে আসেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তার পাশাপাশি যুক্ত হন অনুশীলন সমিতিতে। বঙ্গপ্রদেশের সঙ্গে মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবের বৈপ্লবিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে নির্বাহ করতে থাকেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে কাজ করতে বাংলাভাষা রপ্ত করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু সেবাকাজে অংশ নেন। দামোদরের বন্যাতে মিশনের হয়ে সেবাকাজে অংশগ্রহণ করেন। এত সবের পরেও তিনি বুঝতে পারেন তাঁর উপর নজরদারি করতে গুপ্তচররা সক্রিয়। তিনি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত শান্তি নিকেতন লজে থাকতেন, সেখানে ডাঃ গোপাল বাসুদেব কেতকর নামে এক ব্যক্তি আসেন এবং তাঁকে গুপ্ত সংগঠন শুরু করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। বিভিন্ন দেশভক্ত লোকের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যও বলতে থাকেন। বিষয়টা কেশবের সন্দেহজনক মনে হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ধরাও পড়ে যায় যে, ইনি ইংরেজের গুপ্তচর এবং বাধ্য হয়ে তাকে সেই জায়গা ছাড়তে হয়।

কলকাতায় এক শোভাযাত্রায় এক ইউরোপীয় পুলিশ আধিকারিক তাঁর কাছে মরাঠি ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর মাথায় মরাঠি কায়দায় রাখা শিখা দেখেই পুলিশ আধিকারিক বুঝতে পেরেছে, তাই সেই ধরনের শিখা রাখা বন্ধ করে দেন।

অনুশীলন সমিতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও তিনি যখন বিভিন্ন বিপ্লবীর কাছে জানতে চান তাঁদের কাছে বিপ্লবের

উদ্দেশ্য কী? স্বাধীনতা লাভ তো একদিন হবে তারপর কী? কিন্তু এর কোনো সদুত্তর তিনি পাননি।

১৯১৬ সালে ডাক্তারি পড়া শেষ করেই কাকা আবাজীকে তাঁর বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। নাগপুরে ফিরে আসার পরে পরেই সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েন। বিভিন্ন আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। বিভিন্ন জনসভায় তাঁর বক্তব্য ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রোশকে জনসমক্ষে তুলে ধরে।

অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। কারাবাসে থাকার সময় দেশের এই পরাধীনতার কারণ অনুসন্ধান করেন, তিনি অনুভব করেন ভারতের প্রকৃত নাগরিক হিন্দুদের গ্রাস করেছে একতার অভাব, স্বাভিমানশূন্যতা ও স্বার্থপরতা। তাই কারামুক্তির পর কংগ্রেসের মধ্যেই যুবকদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে তারা কেবলমাত্র চেয়ার পাতা, খাবার পরিবেশন প্রভৃতি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কংগ্রেসের নেতাদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক দিশা ছিল না।

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ১৯২৫ সালে অরাজনৈতিক, রাষ্ট্রভক্ত, সমাজসেবী সংগঠন হিসেবে সঙ্ঘ শুরু করেন। সমস্ত প্রচারের বাইরে থেকে ব্যক্তিনির্মাণের কাজকেই গুরুত্ব দেন। যে সময় হিন্দু পরিচয় দিতেও লোকে সঙ্কোচ করত, হিন্দু সংগঠনকে অসম্ভব কাজ বলে মনে করা হতো এবং ইংরেজদের বক্রদৃষ্টি সবসময়ই ছিল। এসব উপেক্ষা বিরোধিতার মধ্যেও বালক কিশোরদের নিয়ে সঙ্ঘের কাজ করে যান।

সে সময় বহু সংগঠন ভারতের বুকে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছিল। সেই সব মহীরুহের মধ্যে একটা চারা প্রায় সকলের অলক্ষ্যে বেড়ে উঠতে শুরু করে। সাধারণ বালক কিশোরদের সংগঠিত করে প্রখর রাষ্ট্রভক্তির বীজ তাদের অন্তঃকরণে বপন করেন। বিভিন্ন বর্গ ও শিবিরের মাধ্যমে স্বয়ংসেবকদের শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং দেশের বিভিন্ন গৌরবময় ইতিহাস, পরম্পরা প্রভৃতি বৌদ্ধিক বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

সঙ্ঘ শুরুর বছরখানেকের মধ্যেই নাগপুরে লক্ষ্মীপূজার দিনে মুসলিমদের আক্রমণকে স্বয়ংসেবকেরা প্রতিহত করেন। রামটেকের মেলাতে জলসত্র স্থাপন করেন। স্বয়ংসেবকরা ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণা সংগ্রহ করে ঘোষবাদ্য ক্রয় করলে পথসঞ্চলন শুরু হয়। ডাক্তারজী বিভিন্ন স্থান থেকে ভালো ভালো ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক করে সঙ্ঘের শাখায় নিয়ে আসেন। সম্পর্ক করার জন্যই ঘন ঘন চা খাওয়াটাকে অভ্যাসে নিয়ে আসেন।

দূর থেকে স্বয়ংসেবকদের আসতে অসুবিধা হওয়ায় অন্যত্র শাখার বিস্তার ঘটতে শুরু করে। স্বয়ংসেবকেরা উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে চাইলে ডাক্তারজী বিভিন্ন প্রদেশে একেকজনকে পাঠান। সারা ভারতে স্বয়ংসেবকেরা যান এবং সেখানে থেকে সেখানকার ভাষা রীতিনীতি রপ্ত করে সেখানে সঙ্ঘকাজের বিস্তার ঘটান। অগণিত স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিস্তারে নিজের সম্পূর্ণ জীবন দিয়ে দেন। ভাইয়াজী দাণী, যাদব রাও জোশী, উমাকান্ত কেশব আপ্তে, ভাউরাও দেওরস, বালাসাহেব দেওরস প্রমুখ প্রচারক জীবনকে পরম্পরা রূপে তৈরি করেন।

ডাক্তারজী নিজের জীবনকে প্রচারকদের সামনে আদর্শ রূপে তুলে ধরেন। মনুষ্য জীবনের তিনটি মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের কোনোটাই পর্যাপ্ত না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র দৃঢ় মানসিক সংকল্পের কারণে সারা দেশে পরিভ্রমণ করেন। এমনও উদাহরণ পাওয়া যায় যখন তাঁর বাড়িতে কার্যকর্তারা গেলে সামান্য চা করে খাওয়ানোর মতো পরিস্থিতি ছিল না। উপবাস যেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কারও কাছ থেকে যে সাহায্য নেবেন না, তা কার্যকর্তারা জানতেন।

মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনার সময় তৈরি করা কোটটাই সারা জীবনের সঙ্গী ছিল। বহু সময় জুতো ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য খালি পায়েই নাগপুরের গরমে প্রায় দৌড়েই চলাফেরা করতেন। তাঁর বাড়ির কিছু অংশ ভাঙতে শুরু করলে জীবদ্দশাতে তা ঠিক করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অর্থ নেই বলে প্রবাস কখনো বন্ধ করেননি। পায়ে হেঁটেই মাইলের পর মাইল পথ গেছেন।

আমরা প্রায়শই রক্তজল করা পরিশ্রম করার কথা শুনে থাকি। কিন্তু বাস্তবেও তা কেউ করেছে তেমন উদাহরণ হলেন ডাক্তারজী। মাত্র পনের বছরে একটা সংগঠনকে সারা দেশব্যাপী বিস্তার ঘটাতে গিয়ে তিনি যে কঠোর প্রতিশ্রম করেন তার কারণে তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত জল হয়ে যায়। জীবনের শেষ দিকে লাম্বার পাংচার করে তাঁর শরীর থেকে জল বের করতে হয়। ডাক্তাররা অবাক হয়ে যান যখন লিটার খানেক জল বের করার পরও রক্তের চিহ্ন দেখা যেত না।

শরীর চরম অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেখা করা, গল্প করা, সঙ্ঘকাজের বিস্তারের কথাই বলে যেতেন। কখনো অসুস্থ শরীরে প্রবল জ্বরের মধ্যেও বিড়বিড় করে প্রলাপ বকতে শোনা গেছে, কিন্তু তাতেও শুধু সঙ্ঘের কথা।

তাঁর শরীর, মন, বুদ্ধি পূর্ণরূপে সঙ্ঘ। তিনি সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে ভারতকে পরম বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তুলতে সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। রাষ্ট্র ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্র-ধর্ম-সমাজের সেবায় নিবেদিত, স্বাভিমানী, রাষ্ট্রভক্তদের সংগঠিত রূপ তিনি নিজের জীবদ্দশায় দেখে যেতে চান। তিনি বলতেন 'ইয়াচী দেহী ইয়াচী ডোলা' যার অর্থ এই চোখে এই দেহেই তিনি দেখতে চান। বছরের পর বছর সঙ্ঘ চলতে থাকবে এই উদ্দেশ্য ডাক্তারজীর ছিল না। বরং একসময় সঙ্ঘ ও সমাজ এক হয়ে যাবে এমনটাই ছিল তাঁর স্পষ্ট কল্পনা।

সমাজ সংগঠনের জন্য যা যা প্রয়োজন সেইসব ভাবনা তিনি স্বয়ংসেবকদের মধ্যে দিয়ে গেছেন। আজ সঙ্ঘের শতদিক প্রসারী, সর্বব্যাপী সর্বস্পর্শী রূপ আমরা দেখতে পাই, তার সূত্র ডাক্তারজী নিজেই ভাবনা রূপে দিয়ে গেছিলেন। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজ তাঁর সময়কালেই হয়। কিন্তু তিনি সঙ্ঘের মধ্যে মাতৃশক্তিকে যুক্ত না করে তদের পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি চাইতেন মাতৃশক্তি তাঁদের নিজেদের ক্ষমতায় উঠে আসুক।

সঙ্ঘের মধ্যে তাঁদের স্থান করে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা নিজেরাই সমাজে স্থান করে নিক। ১৯৩৬ সালে বিজয়া দশমী তিথিতে লক্ষ্মীবাঈ কেলকরের নেতৃত্বে শুরু হয় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। বাকি সমস্ত সংগঠন পরে তৈরি হলেও তাঁর পরিকল্পনা ডাক্তারজীই করে গেছিলেন।

সমাজের সমস্ত কাজ সঙ্ঘ করবে ডাক্তারজী এই ভাবনার পরিপন্থী ছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলতেন সঙ্ঘ কেবলমাত্র সংগঠন করবে, নিত্য সংস্কারের মাধ্যমে ব্যক্তি নির্মাণ করবে এবং সেই সংস্কারিত ব্যক্তি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজের সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ করবে।

সঙ্ঘ শুরুর পর থেকেই সঙ্ঘ কোনো আন্দোলনে যুক্ত হয়নি ঠিকই কিন্তু ১৯৩০ সালে ডাঃ লক্ষ্মণ বাসুদেব পরাঞ্জপেকে সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব দিয়ে স্বয়ং ডাক্তারজী জঙ্গল সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার জন্য যান এবং কারাবরণ করেন। সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞাতেও সেসময় দেশকে স্বাধীন করার কথা বলা হতো। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামেও বহু স্বয়ংসেবক ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ডাক্তারজী সঙ্ঘের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে যান। সঙ্ঘের আজ্ঞা, প্রার্থনা, গণবেশ, কার্যপদ্ধতি, বর্গ সমস্ত কিছু পরিবর্তন করেন সংস্কৃত, সংস্কার ও সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে। সারা দেশে সঙ্ঘ কাজের বিস্তার ঘটবে, সারা দেশ থেকে স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শিক্ষালাভের জন্য নাগপুরে আসবে, এই উপলব্ধি থেকে তিনি নাগপুরের রেশিমবাগে সেসময় ৫০০ টাকা দিয়ে একটি স্থান ক্রয় করেন। যা আজ সমস্ত স্বয়ংসেবকদের তপোভূমি রূপে পরিগণিত।

ভারতে হিন্দুসংগঠনের বিষয়টিকে একটি অসম্ভব কাজ বলে মনে করা হতো। ডাক্তারজী শুধু একটি হিন্দু সংগঠন তৈরি করেছেন তা নয় বরং মাত্র ১৫ বছরে সারা ভারতের প্রতিটি প্রদেশে তা ছড়িয়ে দেন। ১৯৪০ সালে আয়োজিত সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে সারা দেশ থেকে স্বয়ংসেবকরা অংশগ্রহণ করেন। ডাক্তারজীর শরীর তখন খুবই খারাপ। কোনোভাবেই বাইরে বেরোনো সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলছে, সারা দেশ থেকে স্বয়ংসেবকেরা এসেছে আর তিনি ঘরে বসে থাকবেন, তা কী করে সম্ভব? ডাক্তারি পরামর্শ নিয়ে অল্প সময়ের জন্য ২ জুন বর্গে আসেন। স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীর মুখ থেকে কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল। তাই ৮ জুন ডাক্তারজী সমারোপের দিনে উপস্থিত হন। নিজের চোখের সামনে ভারতের এক ক্ষুদ্র রূপ দেখতে পান। স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ''প্রতিজ্ঞা করুন যে যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, সঙ্ঘকে ভুলবেন না। কোনো মোহ যেন আপনাদের বিচলিত করতে না পারে। আপনাদের জীবনে এমন কথা বলার সুযোগ আসতে দেবেন না যে, পাঁচ বছর পূর্বে আমি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলাম।''

বর্গ থেকে ফিরেই শরীর আরও অসুস্থ হয়ে যায়। নাগপুরের সঙ্ঘচালক বাবাসাহেব ঘটাটেজীর ছিন্দওয়াড়াস্থিত বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেবা শ্রুশ্রূার সমস্ত দায়িত্ব নেন মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর অর্থাৎ শ্রীগুরুজী। কিন্তু কোনো চিকিৎসাই আর কাজে লাগছিল না। ডাক্তারজী সকলকে ডেকে সঙ্ঘের পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক হিসেবে শ্রীগুরুজীকে দায়িত্ব দিয়ে যান। ২১ জুন ইহলোকের সমস্ত মায়া ছেড়ে পরলোক গমন করেন।

ডাক্তারজী আজ পার্থিব শরীরে না থাকলেও শত শত স্বয়ংসেবকের মধ্যে তাঁদের কাজের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে। আধুনিক ভারতের যে রূপ ফুটে উঠছে, তাতে ডাক্তারজীর অবদান সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। □

আলোচনাসভা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দেশীয় জ্ঞান

প্রেম মন্দির আশ্রম, রিষড়া, হুগলী

সুধী,

আগামী ২২শে মার্চ, ২০২৫, শনিবার সকাল দশটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত একটি রাজ্যস্তরীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আলোচনার শিরোনাম: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দেশীয় জ্ঞান (Indigenous Knowledge on Science and Technology)। আয়োজক: 'প্রেম মন্দির জনকল্যাণ সমিতি' এবং 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির'। অনুষ্ঠানস্থল: প্রেম মন্দির আশ্রম, রিষড়া, হুগলী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল নিবন্ধীকৃত ব্যক্তিকে শংসাপত্র প্রদান করা হবে। নিবন্ধীকরণের জন্য শুল্ক ধার্য করা হয়েছে ২০০ টাকা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০০ টাকা (এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকছে সেমিনার সামগ্রী, সকালের চা ও স্বল্পাহার, মধ্যাহ্ন ভোজন, বিকেলের চা এবং সন্ধ্যায় চা ও জলযোগ)। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য একটি লিঙ্ক প্রদান করা হবে, সেই লিঙ্কে আবেদন করতে হবে। অনুষ্ঠানের দিনও সরাসরি কিছুজনের নিবন্ধীকরণের সুযোগ থাকবে। সকল আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ভক্তমণ্ডলী ও সমাজ সংগঠকদের এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিনীত—

ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায় (আহ্বায়ক) এবং
ড. কল্যাণ চক্রবর্তী (যুগ্ম আহ্বায়ক)

বক্তব্য রাখবেন (বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায়)—

প্রথম পর্ব :

ড. মানবেন্দ্র রায়— কৃষিবিজ্ঞান, ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য— জীববিদ্যা
ড. সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— চিকিৎসা বিজ্ঞান

দ্বিতীয় পর্ব :

ড. অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়— ইঞ্জিনিয়ারিং, ড. তথাগত দেব— রসায়ন
ড. কাঞ্চনকুমার পাত্র— পদার্থবিদ্যা, ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায়— অঙ্ক

সঞ্চালনা : মিলন খামারিয়া, অনির্বাণ দে, সূর্যশেখর হালদার।

ব্যবস্থাপনা : প্রেম মন্দির আশ্রম, দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির, অনির্বাণ দে ও রতন চক্রবর্তী।

পূর্ণমহাকুম্ভ : এক অখণ্ড ভারত দর্শন

শিতাংশু গুহ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে (সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে) লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণভয়ে পায়ে হেঁটে দূরদূরান্তে পালাতে দেখেছি। অর্ধ-শতাব্দী পর ২০২৫ সালে প্রয়াগরাজে কোটি কোটি মানুষকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পদযাত্রায় 'মহাকুম্ভ' স্নানে যেতে দেখলাম। ১৯৭১ ও ২০২৫ দুটোর আমি অংশীদার, সাক্ষী। পার্থক্য হচ্ছে, ১৯৭১-এ ছিল অনিচ্ছায়, জীবন বাঁচাতে। আর ২০২৫ স্বেচ্ছায়, জীবন সার্থক করতে অথবা জীবনের পরমার্থ খুঁজতে। একান্তর আমার জীবনের ঊষা, মহাকুম্ভ সন্ধ্যালগ্নে।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজে পৌঁছাই দুপুরের শুরুতে। হোটেলটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে। অন্য সময়ে হয়তো এসব হোটেলের ভাড়া ৩/৪ হাজার টাকা, মহাকুম্ভের মহাসমারোহে তা আট-দশগুণ বেশি। প্রথম দিকে এতটা ছিল না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাম বেড়েছে। হোটেল পাওয়াটাই যেন ভাগ্যের বিষয় ছিল, আমরা দু'রাত ছিলাম। অমৃতস্নান বা পুণ্যস্নান করেছি। এসব আমার আলোচ্য নয়, ওয়েবে এর ছড়াছড়ি।

আমাদের হোটেল ছিল রাস্তার ওপর। সারারাত মানুষের চলাচল, যানবাহনের ভ্যা-ভু, সরব কথাবার্তায় ঘুমানো দায়। দেখেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষ হেঁটে যাচ্ছে কুম্ভের দিকে। আবালবৃদ্ধবনিতা সেই মহোৎসবে ধাবমান। দিনরাত-সকালসন্ধ্যা পুণ্যার্থীদের যাত্রা ছিল অবিরত, বিরামহীন। রাত ২টায় যা, ভোর বা সন্ধ্যায়ও তাই। এ এক অপূর্ব-দৃশ্য, কারো অভিযোগ নেই, কেউ খালি পায়, কেউ স্যান্ডেল বা কেডস। কারও কারও মাথায় ছোট্ট পুঁটলি, কারও ব্যাকপ্যাক বা স্যুটকেস।

গুগল বলছে, প্রয়াগরাজের আয়তন ৫৪৮২ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা (২০১১ জনগণনা অনুযায়ী) প্রায় ৬০ লক্ষ। বলা হচ্ছে, ৬৬৫ মিলিয়ন বা ৬৬ কোটি পুণ্যার্থীর পদচারণা হলে কী হতে পারে? ১৭ কোটির বাংলাদেশে ৬৭ কোটি মানুষ গেলে কী হতো? প্রয়াগরাজে কিন্তু কোনো ছিনতাই হয়নি, ধর্ষণের কথা শোনা যায়নি, লুটপাট-রাহাজানি হয়নি। মানুষ শিবির ছাড়াও রাস্তা-ঘাট-পার্কে ঘুমিয়েছে, কেউ ক্ষুধার্ত ছিল না, কেউ ঢিল মারেনি, সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কবি বলেছেন, 'কিসের নেশায়, কিসের আশায় ঘুরছে ওরা দিগন্তরে?' ১৪৪ বছরের মহাকুম্ভ— জীবনে একবার। 'পুণ্যার্জন' সাইড লাইনে রাখলেও এমন দৃশ্য সামনে থেকে দেখা বা এর অংশীদার হওয়া সবার ভাগ্যে জোটে না, সেই অর্থে যাঁরা কুম্ভে গেছেন তাঁরা ভাগ্যবান। স্ত্রী আলপনার ইচ্ছাপূরণে আমার কুম্ভে যাওয়া, রবি ঠাকুরের কবিতা একটু পালটে দিয়ে বলা যায়, 'সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য—'। পাপ-পুণ্যের হিসাব নয়, মূলত এ বিস্ময়কর ঘটনার অংশীদারিত্বই মুখ্য। 'মহাকুম্ভ ২০২৫' ইতিহাসের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশের সাক্ষী হলো গোটা বিশ্ব। ৪ হাজার হেক্টর জুড়ে কুম্ভনগরী, ১২ কিলোমিটার স্নানঘাট, ৬৭ হাজার স্ট্রিট লাইটে আলোকিত হয়ে ওঠে কুম্ভনগরী।

আলাপচারিতায় জানা যায়, উত্তর-দক্ষিণ ভারতের মানুষ বেশি কুম্ভে গেছেন। গ্রামের পর গ্রাম সবাই মিলে সপরিবারে পুণ্যস্নানে গেছেন। ভাবা যায়, ভারতের অর্ধেক মানুষ বা আমেরিকার জনসংখ্যার দ্বিগুণ এতে অংশ নিয়েছেন। এ মহামিলন যজ্ঞ সার্থক। বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছে থাকলেও ভিসা সমস্যার কারণে খুব বেশি মানুষ আসতে পারেনি।

সঙ্গমে নেমে আমি অবাক হই, জল এত স্বচ্ছ কেন? কোটি কোটি মানুষ যেখানে স্নান করছে সেখানে ঘোলা জল থাকার কথা, কিন্তু না, জল স্বচ্ছ ছিল, ঘোলা ছিল না। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বুঝেছি, স্বচ্ছ জলরাশির কারণ হচ্ছে, 'স্রোতধারা', গঙ্গায় স্রোত বহমান ছিল, যা সকল ময়লা বয়ে নিয়ে যায়। যাঁরা বলেছেন, ব্যাকটিরিয়া কিলবিল করেছে, তাঁদের বলা যায় কিছু ব্যাকটিরিয়া থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অতটা নেতিবাচক ভাবাটা ঠিক নয়। যাঁরা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটেন, তাঁরা সাঁতার শেষে উঠে পুনরায় বিশুদ্ধ জলে স্নান করেন, মানুষ কিন্তু কুম্ভে স্নান করে উঠে আবার বিশুদ্ধ জলে স্নান করেনি, আমরাও করিনি।

মহাকুম্ভে বড়োলোকের জন্যে কোনো পৃথক ঘাট দেখিনি, ব্রাহ্মণের জন্যেও নয়, নারী-পুরুষের জন্যেও ভিন্ন ভিন্ন ঘাট দেখিনি। আমি দেখেছি ধনী-দরিদ্র-জাতপাত-নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই এক সঙ্গে স্নান করছে। উচ্চ-নিম্ন দেখিনি। ভেজাকাপড়ে নারীর শরীর দেখার নিমিত্ত কারও 'অসুন্দর' দৃষ্টি আমার চোখে পড়েনি। কেউ মারামারি করেনি, বোমা মারেনি বা কেউ না-খেয়ে ছিল, তা শুনিনি, কারুর স্যান্ডেল চুরি যায়নি। দেখেছি এক মহাযজ্ঞ, হিন্দুদের এক মহা-মিলনমেলা।

মহাকুম্ভে ৩০ জন পুণ্যার্থী মারা গেছেন, খুবই দুঃখজনক। ১ জনও মারা যাওয়া উচিত ছিল না। ৬৬ কোটি মানুষের মধ্যে ত্রিশ জনের স্বর্গপ্রাপ্তি দুঃখজনক হলেও কুম্ভমেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনার চমৎকারিত্ব নষ্ট হয়ে যায় না। এ সময়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড়ো সমাবেশে এতটা সুশৃঙ্খলতার কৃতিত্ব রাজ্য সরকারের সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি পুণ্যার্থীর। এমন শান্তিপূর্ণ, বিশাল জনসমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ এতটা দক্ষতার সঙ্গে এমনটা করতে পারতো কিনা সন্দেহ আছে। আসলে বিশ্বে এতবড়ো সমাবেশের কোনো উদাহরণ নেই?

মেলায় পূজারি বা পাণ্ডাদের উৎপাত ছিল না। কেউ কেউ যে ফুল-বেলপাতা বা নারকেল দিয়ে পূজা দেননি তা নয়, দিয়েছেন, 'গঙ্গা মাইয়া'র পূজা অনেকেই দিয়েছেন, তবে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ পূজার দৃশ্যপট ভিন্ন। ছোটো ছোটো সাজিতে ফুল অনেকেই ভাসিয়েছেন গঙ্গায়, যা ভেসে ভেসে যমুনায় এসে অপূর্ব রঙিন দৃশ্যের সৃষ্টি করে। আধ-ছোলা নারকেল ভেসে যাওয়া সবাই দেখেছে, আমি দেখেছি মাঝিরা সেই নারকেল তুলে পরিষ্কার করে নৌকায় রেখে দিতে, হয়তো বাড়ি নিয়ে যাবে অথবা বিক্রি করে দুটি পয়সা রোজগার করবে।

আমরা দশ কিলোমিটার হাঁটিনি। অনেকেই হেঁটেছেন। অনেকে আরও বেশি হেঁটেছেন। মেলায় যেতে আসতে আমরা সাকুল্যে ৪/৫ কিলোমিটার হেঁটেছি, অনেকটা সান্ধ্য-ভ্রমণের মতো। মেলার সান্ধ্যকালীন সৌন্দর্য্য অপূর্ব। মেলায় বহুরকমের যানবাহনের মধ্যে একটি হচ্ছে মোটর সাইকেল, এটি বেশ জনপ্রিয় ছিল, কারণ এটি ভীড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কুম্ভে এদের রোজগার বেশ ভালো ছিল বলেই মনে হয়। আমরা ৬/৭ কিলোমিটার মোটর সাইকেলে পাড়ি দিই; চালক আমি, পেছনে আমার পত্নী। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা, অবশ্য কিছুটা বিপজ্জনক।

এত লোকের মাঝে মহাকুম্ভে আমাদের কি কষ্ট হয়েছিল? মোটেও না। একজন বললেন, 'ভক্তের বোঝা ভগবান বয়'। বললাম, তা হয়তো, তবে 'ডলার' কিছুটা খরচ হয়েছে তা বলা যায়। ডলারটা ভগবানের দেওয়া ধরলে, বোঝাটা পরোক্ষভাবে তিনিই রয়েছেন তা বলা বাহুল্য। কথা হচ্ছে, মহাকুম্ভ মেলার তেমন সমালোচনার সুযোগ নেই। যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে। এটি গৌরবের ইতিহাস। অর্থনৈতিকভাবে এ মেলায় সরকার, স্থানীয় জনগণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোই হয়েছে, সবাই লাভবান। পুণ্যার্থীরা পুণ্যার্জন করেছেন, অনেকে জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে হয়েছেন ভাগ্যবান। □

মহাকুম্ভে জাগ্রত হয়েছে এক নতুন ভারত

দীপ্তাস্য যশ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারততীর্থ কবিতায় লিখেছিলেন,

'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে—

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে' কথার অর্থ যেমন মহাভারতের গল্পে যা পাওয়া যায় না, তা ভারতবর্ষেও পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনই বোধহয় বলতে পারি যা কুম্ভে দেখা যায় না, তা ভারতবর্ষেও দেখা যায় না। কুম্ভে ব্রাহ্মণ বা দলিত নেই। এখানে সবাই হিন্দু'। কুম্ভ দর্শনেও ঠিক একই অনুভূতি আসে। এখানেই সবাই ভারতবাসী, সবাই হিন্দু। সনাতনের আদি রূপই প্রত্যক্ষ হয় কুম্ভের সঙ্গমস্থল।

সঙ্গমস্থলকে কেন্দ্র করে তাঁবুর সারি। রাতের বেলায় সারি দিয়ে লাগানো আলো জ্বলে উঠলে যেন মনে হয় আলোকের ঝরনা ধারায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। স্রোতস্বিনী গঙ্গা, যমুনার সঙ্গে মিশে আলোকোজ্জ্বল চরাচরকে এসে নিজের আদরের স্পর্শ দিয়ে আশীর্বাদ

গেলে যেন ভারত দর্শন হয়। রাজস্থানের গ্রাম থেকে আসা পরিবার যেমন দড়ির এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত ধরে হেঁটে চলছে সঙ্গমের দিকে। তেমনই দেখেছি আশি বছরের বৃদ্ধা মা, তার দুই পুত্রের কাঁধে ভর দিয়ে চলেছেন কুম্ভের দিকে। সঙ্গমে যেমন ডুব দিচ্ছে গুজরাটি ব্যবসায়ী, তেমনই ডুব দিচ্ছে বাঙ্গালি চাকুরিজীবী। সঙ্গমস্থলে যেন ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পুরো ভারতবর্ষ এক হয়ে গেছে। সেখানে জাতপাতের কোনো ভেদাভেদ নেই, নেই দরিদ্র বা ধনীর কোনো তফাৎ।

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের একটি ভিডিয়োতে দেখেছিলাম এক যুবককে সাংবাদিক জিজ্ঞেস করছেন, তার জাত কী? জবাবে যুবকটি বলেছিল, 'এখানে কেউ করে যাচ্ছে। মেলা প্রাঙ্গণে না চাইতেও মানুষ একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে এক আত্মীয়তার বন্ধনে। ঘাটে বসে থাকার সময় যেমন আমার আলাপ হলো উত্তরাখণ্ড থেকে আসা অলোকের সঙ্গে। অলোক কুম্ভে আসার কারণ জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল, 'ইহা পে তো ব্যাস আনা থা', অর্থাৎ এখানে তো আসতেই হতো। ঠিক যেমন আলাপ হয়েছিল বিহারের ছাপরা থেকে যাওয়া সোনী দেবীর।

কুম্ভে কেউ হয়তো গিয়েছিলেন ধর্ম দর্শনে, কেউ-বা গিয়েছিলেন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। আবার আমার মতো অনেকেই গেছিল ভারতদর্শনের আশায়। ভারতবর্ষ মানে যে গ্রামীণ ভারত, সেই ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণার রূপ প্রত্যক্ষ হয় চোখের সামনে। যে যা খুঁজতে চেয়েছিল, সে যেন তাই খুঁজে পেয়েছে। দর্শনার্থী দর্শন পেয়েছে, তীর্থযাত্রী শান্তি পেয়েছে। আবার আমার মতো পর্যটকরা ভারতবর্ষের দর্শন পেয়েছে। এই যে আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তি, এই তো মুক্তি। দুর্ভাগ্য তাদের যারা এর মধ্যে রাজনীতি খুঁজতে গিয়ে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারলেন না। তারা রাজনীতির পাঁকেই আবদ্ধ হয়ে রয়ে গেলেন। তাদের আবার ভারতবর্ষের এই সনাতন রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বারো বছর।

মেলার ব্যবস্থাপনার দিকটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এই বিপুল ব্যবস্থাপনা না হলে কুম্ভের দর্শন হয়তো এতোটাও সার্থক হতো না ছেষট্টি কোটি দর্শনার্থীর জন্য। সব থেকে যে বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে, মেলা প্রাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতা। এতো কোটি কোটি মানুষের আগমন, প্রতিদিন যেখানে গড়ে দেড় কোটি দর্শনার্থীর পদার্পণ হচ্ছে সেখানে এতোটুকু নোংরা, আবর্জনা কোথাও নেই। কোথাও এতোটুকু দুর্গন্ধ নেই। মানুষ সঙ্গমে বা আরও তিরিশটি ঘাটে চান করার সময় সেখানে ফুল দিয়ে মা গঙ্গার পূজা করছে। তারপরেও গঙ্গার জলে সেই ফুল ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হচ্ছে না। মানুষ এবং মেশিন দুইই সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে

পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য। আমার দেখে মনে হয়েছে, শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনায় এই এত বড়ো আয়োজন সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব নয়। নিজ কর্ম এবং নিজ দায়িত্বের প্রতি অসম্ভব সমর্পণ না থাকলে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা দিয়ে এই যজ্ঞস্থল পরিষ্কার রাখা সম্ভব নয়।

শুধুমাত্র সাফাই কর্মীদের কথা নয়। পুরো শহর জুড়ে অসংখ্য পুলিশ, বিএসএফ এবং অন্যান্য আরও নানা নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা জনস্রোত সামলে চলেছেন হাসিমুখে। কারুর মুখে এতোটুকু বিরক্তি নেই। কোনো প্রশ্নে রেগে যাওয়া নেই। প্রত্যেকে হাসিমুখে নিজের কাজ করে চলেছেন। ওখানেই আলাপ হয়েছিল সুনন্দ নামের এক বাঙ্গালি ছেলের সঙ্গে। দুর্গাপুরে বাড়ি, বিএসএফে চাকরি করে। আমার পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি দেখে নিজেই এগিয়ে এসে আলাপ করল। দেড়মাস ডিউটি দিচ্ছে প্রয়াগরাজে। মুখে অমলিন হাসি। জানাল, এখানে ডিউটি করতে তার নাকি দারুণ লাগছে।

কুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে কুম্ভের তথা ভারতবর্ষের কেউই কিছু বিগড়াতে পারবে না। বরং ভারতবর্ষকে ভাঙতে গেলে তারাই ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে।

এই ভারতবর্ষ মহাকুম্ভের মহা সঙ্গম। এই ভারতবর্ষ তার শিকড়ে ফিরছে। এই ভারতবর্ষ হিন্দুদের মাথা উঁচু করে চলার ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ অন্য ধর্মকে সম্মান করে, কিন্তু নিজের ধর্মকে ভুলে গিয়ে নয়। এই ভারতবর্ষ সেই প্রাচীন দর্শন হতে উঠে আসা উন্নত ভারতবর্ষ।

হিন্দুত্ব এই ভারতবর্ষের চালিকাশক্তি। হিন্দুত্ব এই ভারতবর্ষের আত্মা। হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের দর্শন।

'আসেতু হিমাচল'-এর ভারত দর্শনে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই এই ঐতিহ্যের অংশীদার। এই মাটিতে জন্ম নিয়েও যারা এই দর্শনে বিশ্বাসী হতে পারে না তাদের থেকে বড়ো দুর্ভাগা আর কে আছে। যাদের উত্তরাধিকারের শিকড়টাই হারিয়ে গেছে তাদের মতো দুর্ভাগ্য আর কার। তাই আজকে যখন সেকুলার নেতা-নেত্রীরা 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে সেই অভাগাদের মন জোগাতে চান তখন তাদের দুরবস্থা দেখে করুণা হয়।

ভারতবর্ষের এই বিশালতা, এই নিবেদন বোধবুদ্ধির বাইরে। তাই বৃথা আস্ফালন আর বৃথা বাগাড়ম্বরে ভারতকে ছোটো করার চেষ্টা করতে গিয়ে তারা নিজেরাই ছোটো হয়ে যাচ্ছেন। 'ব্রাহ্মণত্ব' সেখানে নেহাতই অহেতুক। ভারতবর্ষের এই যে ঐক্যবদ্ধ রূপ ছেষট্টি কোটি ভারতবাসী সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরল, সেই দেখেই রাজনীতির কারবারিরা আশঙ্কিত ও আতঙ্কিত। তারা যে ভারতবর্ষকে বহু ভাগে বিভক্ত করতে চান, এই কুম্ভ তাদের সেই চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

কুম্ভ একটা ঘোরের মতো। কুম্ভে একবার গেলে কুম্ভ থেকে ফিরে এলেও আর ফেরা হয় না। কুম্ভ যেন গেঁথে থাকে মাথার মধ্যে।

কুম্ভ আমাদের ভারতবর্ষ, কুম্ভে গেলে ভারতবর্ষের স্বাদ পাওয়া যায়। পুণ্যের স্বাদ কতোটা কী পাওয়া যায় জানি না, কিন্তু কুম্ভে গেলে ভারতবর্ষের যে স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ পাওয়া যায় তার লোভ ছাড়া চাট্টিখানি কথা নয়। কুম্ভ হলো ভারতবর্ষের মনের প্রশান্তি। কুম্ভ ভারতবর্ষের আত্মা। কুম্ভ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা। কুম্ভ ভারতবর্ষের দর্শনের বাস্তব চিত্র।

এই যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল তারপরেও কী মানুষ কুম্ভ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল? চিত্র তা বলছে না। তারপরেও কোটি কোটি মানুষ গেছে কুম্ভের দিকে। কীসের টানে? পুণ্য? না, শুধু পুণ্যের জন্য নয়। ভারতের বিরাট রূপকে দর্শন করার জন্য।

গ্রামীণ ভারতবাসী, শহরের মধ্যবিত্ত ভারতবাসী, উচ্চবিত্ত ভারতবাসী। উচ্চ-নীচ, জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ নেই।

পায়ে হেঁটে, ট্রেনে ঝুলে পৌঁছে যাচ্ছে কুম্ভে। সব ভিড় গিয়ে মিশে যাচ্ছে সঙ্গমে। সেখানে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। সেখানে উঁচু, নীচু নেই। গরীব, বড়লোক নেই। সবাই গিয়ে ডুব দিচ্ছে একই সঙ্গে, একই জায়গায়। এটাই আমার ভারতবর্ষ। বুদ্ধিজীবীদের নির্ধারণ করে দেওয়া ধর্মীয় গণ্ডির ধার ধারে না। ওদের বিশ্বাস ওদের আচারে, বিচারে, আধ্যাত্মিকতায়।

এই যে দেখছেন এক শ্রেণীর 'বুদ্ধিজীবী' কুম্ভযাত্রীদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেই চলেছেন আসলে তারা ভীত। একদা ভারতীয় শাসককুলের তরফে তাদের দেওয়া মৌরসিপাট্টা বা ধর্মের ঠিকাদারি আজ যেন তাদের হাত থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ওই সাধারণ ভারতবর্ষের হাতে। তাই তারা শঙ্কিত। তারা চিন্তিত নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ঠিক যেমন চিন্তিত 'মীম এবং ভীম'। কারণ ভারতবর্ষ কুম্ভে দুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ভারতবর্ষ এক।

কুম্ভ যেন ভারতবর্ষের আত্মা। সকলেই হেঁটে চলে সেই আত্মার স্পর্শ পাওয়ার জন্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। নিজের উত্তরাধিকারকে বহন করে এক কুম্ভ থেকে আরেক কুম্ভে। কোনো ধাক্কাধাক্কি নেই। কোনো চিৎকার, মারামারি নেই। খুন, জখম, রাহাজানি নেই। কারণ সবাই ভারতবর্ষের আত্মাকে স্পর্শ করতে চায়।

তাই তো কুম্ভে গেলে মনে হয়, 'ইহা পে তো ব্যাস আনা হি থা'। এখানে তো আসতেই হতো। নাহলে ভারতদর্শন অপূর্ণ থেকে যেত।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট খণ্ডের গোপালপুর শাখার স্বয়ংসেবক নবীন চন্দ্র মাহাত গত ১১ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী, ২ পুত্র ও নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার কালিয়াচক খণ্ডের গোলাপগঞ্জ শাখার স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন প্রচারক অধুনা কাশীবাসী ব্রহ্মচারী হৃষীকেশ মহারাজের মাতৃদেবী মালতী সরকার গত ২৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

দেশ, জাতি, সমাজ রক্ষার্থে হিন্দু ঐক্য বিশেষ জরুরি

অমলেশ মিশ্র

অতি সম্প্রতি ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সংগঠিত করার একটি স্লোগান শোনা যাচ্ছে। এই নবতম উদ্যোগটি প্রশংসাযোগ্য।

মানুষ মাত্রেই হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করে। হিন্দু হওয়ার জন্য কোনো সুন্নত বা ব্যাপ্টাইজেশন দরকার হয় না। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ে, যেগুলিকে ভুলক্রমে ধর্ম বলা হয়, যেতে গেলে সুন্নাহ মানার বা ব্যাপ্টাইজড্ হওয়ার দরকার হয়। যারা ব্যাপ্টাইজেশন হয়ে অন্য সম্প্রদায়ে চলে গেলেন, তাঁরা সেই সম্প্রদায়ের নাম ও সাম্প্রদায়িক রীতি নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু যাঁরা— জন্মগতভাবেই হিন্দু, তাঁরা কথাবার্তায়, কাজে কর্মে কোনো বিশেষ মত-পথের পৃষ্ঠপোষক হয়ে গেলেন এবং সেই পরম্পরার মানসিকতা নিয়েই হিন্দু থেকে গেলেন। কিছু মানুষ আবার জন্মগত ভাবে হিন্দু কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে অহিন্দু। যারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান বা খ্রিস্টান হলেন তাদের আনুগত্য এদেশে থাকে না। নাগরিকত্ব এদেশেই থাকে।

যাঁরা হিন্দুদের সংগঠিত করার স্লোগান দিয়ে কাজ শুরু করতে চান তাঁরা এই হিন্দুদের নিয়ে কী করবেন?

আর এক দল হিন্দু আছেন যাঁরা কোনো না কোনো হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু হিন্দু স্বার্থে কুটোটি নাড়ান না। এই হিন্দুরা বড়ো অদ্ভুত। স্থানীয়ভাবে বা বিশ্বব্যাপী সংগঠনটি ব্যাপৃত। এরা হিন্দুদের ক্লেশে সামান্যও বিচলিত নন। নিজেদের কাজ-কর্ম নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। এমনও হতে পারে যে তাঁরা সংগঠিত অন্য কোনো হিন্দু প্রতিষ্ঠানের প্রতিও ভ্রাতৃভাবাপন্ন তো ননই, এমনকী বিদ্বেষ যুক্ত। হয়তো ওই সংগঠনের সমর্থক অনেকেই হিন্দু বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক। অথচ এই ধরনের হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলির প্রতি বহু হিন্দুর অশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে।

লক্ষণীয় হলো সংগঠিত হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলির কোনো কোনোটির সৃষ্টি হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু ১৯৪৭-এ পূর্ববঙ্গটি পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হওয়ায় ওই হিন্দু ধর্ম সংগঠনটি ভয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে এবং পরিপুষ্টও হয়েছে। তাঁরা যে কেন পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন করেন বোধগম্য নয়। যদিও তাঁরা সকলেই এরকম নন।

যাঁরা হিন্দুদের সংগঠিত করার ডাক দিয়েছেন তাঁদের এদের বিষয়েও লক্ষ্য রাখার দরকার আছে বলে মনে হয়। আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখতে পাব যে কেবলমাত্র হিন্দু ও হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য ৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দুরা প্রায় ২১০০ বছর ধরে যুদ্ধ করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মবলিদান দিয়েছেন।

'শহিদ' শব্দটির পরিবর্তে 'বীরগতিপ্রাপ্ত' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। 'শহিদ' কেবল তাঁরাই যাঁরা আল্লার স্বার্থে 'আল্লার পথে' প্রাণ দিয়েছে--- অর্থাৎ ইসলাম রক্ষার জন্য, ইসলামের স্বার্থে প্রাণ দিয়েছে। 'শহিদ' শব্দটি সংস্কৃত বা বাংলা বা কোনো ভারতীয় ভাষার নয়। এটি একটি আরবি শব্দ যা কেবল ইসলামিদের জন্য। আল্লার পথে প্রাণ দেয় কেবল ইসলামপন্থীরাই।

১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতীয়রা আত্মবলিদান দিয়েছেন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যেখানে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়টি প্রধান ছিল। অপরদিকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষাটাই প্রাধান বিষয় ছিল যদিও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আদৌ উপেক্ষিত ছিল না। রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবন আলেখ্য তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

তিনটি নাম উল্লেখ করলাম যদিও আরও বহু নাম আছে যাঁদের নাম আমাদের কথিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পুস্তকগুলিতে উল্লেখিত হয়নি। আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধে পুরুর নাম উল্লেখিত হলেও ভুল কথা লেখা হয়েছে। ঘটনাটি ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

ইসলামি মজহব ও খ্রিস্টান রিলিজিয়ানের সংগঠনগুলি তাদের বিশ্বাসরক্ষা ও বিস্তৃতির কাজ সর্বদাই করে। এই কাজের জন্য বিশেষ সংগঠনও আছে— মিশনারি ও জামাত। কিন্তু হিন্দুধর্ম সংগঠনগুলি হিন্দুধর্ম বিস্তার করুক না করুক, ধর্মরক্ষার কাজও করে না এবং এ ব্যাপারে ওদের মতো, হিন্দু সংগঠনগুলির কোনো শাখা নেই। মজার ব্যাপার হলো, ধর্ম সংগঠনের শাখা না হয়েও যারা হিন্দুধর্মের রক্ষার কাজ করে— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি যে সব সংগঠন আছে তাদের মিত্র থাকুক বা না থাকুক, শত্রুর অভাব নেই। ইসলাম বা খ্রিস্টানদের সাধারণ মানুষ কখনো ধর্ম সংগঠনের তাদের শাখাগুলির বিরোধিতা করে না। খ্রিস্টানদের প্রধান ব্যক্তি 'পোপ' ঘোষণা করেছেন এই তৃতীয় সহস্রাব্দতে সারা বিশ্বকে খ্রিস্টায়িত করার চেষ্টা চলবে। অবশ্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলে থাকে--- সারা বিশ্বকে সুধী ও সমৃদ্ধশালী করা হবে।

আমার মনে হয়, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে মেকি ইসলামি আর মেকি খ্রিস্টান হয়তো নেই। যদিও মহম্মদ ও ইসলামের তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচনকারী কিছু পুস্তক আমি পড়েছি। যেমন— ড. আলি সিনার লেখা --- Understanding Muhammad and Muslims। আনোয়ার শেখ রচিত— This is Jehad ! ও Islam and Human Rights।

তাঁদের লেখা ওই সব পুস্তক এদেশ থেকে প্রকাশিত হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি কথা আমার খুব পছন্দের। আমি মেনেও চলি— একটি হলো গর্ব করে বল আমি হিন্দু এবং দ্বিতীয়টি হলো জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ভারতের যে কোনো আইনসভা মুসলমান স্বার্থ সম্বন্ধিত কোনো বিষয় উঠলেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের আইনসভার সদস্যরা একমতের হয়ে যান— তখন আর কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ডান অথবা বাম, সমাজবাদী ইত্যাদি দলের আইনসভার সদস্যরা একই সুরে কথা বলেন। অথচ হিন্দু সদস্যরা এক সুরে কথা বলেন না।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে ভারতের মুসলমান বা খ্রিস্টানরা— জাতি হিসেবে হিন্দু, সম্প্রদায়গত ভাবে অন্য। সম্প্রদায়ের থেকে জাতি বড়ো। জিন্নার সাম্প্রদায়িক হয়ে যাওয়ার অন্য কারণ ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে গণপরিষদে জিন্নার ভাষণটি ওই প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। জাতি হলো মানুষের বস্তু আর সম্প্রদায় হলো ইসলামি বা খ্রিস্টানি। সম্প্রদায় পরিবর্তন করা যায়, জাতি পরিবর্তন করা যায় না।

মুসলমান মানে যেমন সকলেই আক্রমণাত্মক মুসলমান, হিন্দু মানে সবাই সক্রিয় হিন্দু নন। মুসলমানদের পাক কিতাব মাত্র একটি এবং সেটিই আক্রমণাত্মক। বলা হয় ওই কিতাবটি Political এবং Military-ও বটে। ওই একমাত্র কিতাব ছাড়াও আছে হাদিস গ্রন্থ— যেখানে মহম্মদ কীভাবে নিজের জীবনযাপন করতেন তা লিপিবদ্ধ।

মুসলমানেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মহম্মদকে অনুকরণের চেষ্টা করেন। জানা যায় যে মুসলমান নেতা ইমাম হানি বল (৭৮০-৮৫৫ খ্রি.) জীবনে কখনো তরমুজ খাননি। কারণ তিনি যদিও জানতেন যে নবি মহম্মদ তরমুজ খেতেন কিন্তু কীভাবে খেতেন তা কোনো হাদিসে পাওয়া যায়নি। এই হলো হাদিসের গুরুত্ব।

ধর্মনিষ্ঠ, সক্রিয় হিন্দু সত্যিই বিরল। তাই হিন্দুদের সংস্কারিত করা দরকার যাতে দেশ ও ধর্ম সুরক্ষিত থাকে। এইটিই প্রাথমিক কাজ। মনে রাখতে হবে হিন্দু দেব-দেবীরা সশস্ত্র।

হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে ভণ্ড সংখ্যা অনেক বেশি। রাজনৈতিক কারণেই অর্থাৎ নিজস্ব ও পারিবারিক স্বার্থরক্ষায় তারা ক্ষমতায় আসতে চান এবং এসে টিকে থাকতে চান। তাই তাঁরা অক্লেশে মুসলমান তোষণ করেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাচীনতম দলটি এবং রাজ্য বিশেষের ক্ষেত্রে যেমন পশ্চিমবঙ্গে যে দল একবার ক্ষমতায় বসে সে অন্তত পরবর্তী ৩০ বছর বসে থাকতে চায়। ভোটের ফলে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। হিন্দুদের ভোট যদিও বেশি কিন্তু বহুভাগে বিভক্ত। মুসলমান ভোট অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু সর্বদাই একমুখী এবং সেই মুখটা নির্ধারিত হয়— কে এলে তারা আরও বেশি সুবিধা পাবে। ফলে তাদের হিসেবে যে দল এলে তাদের উপকার হয় তাদের ভোট সেই মুখেই যায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাদের 'দুধেল গাই' বলে থাকেন। যেহেতু ওই গাইটি বেশি দুধ দেবে বা দেয় তাই তাদের একটা তোয়াজ করতেই হয়। তারা একদিকে ইদের নামাজও পড়েন অপর দিকে মন্দিরও স্থাপন করেন। তবে মন্দিরটিকে 'হিন্দু মন্দির' বলেন না— সেগুলি 'সংস্কৃতি'র মন্দির। অথচ তাঁরা আবার কুম্ভ ও মহাকুম্ভের তফাত বোঝেন না।

যারা হিন্দুদের সংগঠিত করতে চান তাদের এ বিষয়ে মেকি তথা ক্ষমতালোভী হিন্দুদের কথাও মাথায় রাখতে হবে। সাধারণ হিন্দু ভোটাররা শুধু সুবিধাটুকুর কথাই ভাবেন। তাঁদের মাথায় দেশের স্বার্থের কথাটা ঢোকাতে হবে। কাজটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। □

ADMISSIONS OPEN 2025

NIBEDITA VIDYAMANDIR

English Medium School

Based on CBSE board curriculam and NEP 2020

Under : Nibedita Seba Trust, Medinipur

Kalikanagar, Gourhari Bhaban (Ramakrishna Nagar Park, East side), Dharma, Paschim Medinipur)

ADMISSIONS (AGE OF THE CHILD) :

(Play Group)	:	2-3 Years
(Nursery)	:	3-4 Years
(Jr. K. G.)	:	4-5 Years
(Sr. K. G.)	:	5-6 Yeras

Mob. : 9932620399, 7001369911, 7407269744

Physical, Mental, Intellectual, moral and spiritual development of children is our motto.

বুদ্ধির পরীক্ষা

এক সময় বন্দীপুর রাজ্যে রাজত্ব করতেন রাজা মানিকচন্দ্র। রাজা ছিলেন খুবই প্রজাবৎসল। রাজ্যের প্রজারাও ছিল খুবই

সাধারণ ও নিরীহ। রাজা খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। সবসময় ন্যায়বিচার করতেন। তারফলে রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে কখনো ঝগড়া হতো না।

রাজধানী বন্দীপুর নগরের প্রজা ভবেশ আর গোপাল দুই বন্ধু ছিল। তারাও খুব বুদ্ধিমান। তারা একে অপরের বুদ্ধির প্রশংসা করত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভবেশ তার বন্ধু গোপালের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া শুরু করল যে কার বুদ্ধি বেশি? বহুক্ষণ তর্ক করেও তারা ঠিক করতে পারল না যে কে বেশি বুদ্ধিমান। এর মীমাংসা করতে তারা রাজা মানিকচন্দ্রের রাজসভায় যাওয়া স্থির করল।

পরদিনই তারা দুজনে রাজাসভায় এসে হাজির হলো। রাজাকে সব কথা বলে তার মীসাংসা করে দিতে অনুরোধ জানালো। রাজা তাদের দুজনের কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর একটু ভেবেচিন্তে বললেন, আমি একটি প্রশ্ন করছি, তার উত্তর আগামীকাল রাজসভায় এসে দিতে হবে। যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে সেই বেশি বুদ্ধিমান প্রমাণিত হবে। প্রশ্নটি হলো, তোমার মাথায় কটি চুল আছে? দুই বন্ধু এই আজব প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেল। দুজনেই রাজাকে অভিবাদন করে সেই প্রশ্নের উত্তর ভাবতে ভাবতে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো।

সত্যি কথা হলো, ভবেশের একটু হলেও গোপালের থেকে কম বুদ্ধি। ভবেশ বাড়ি ফিরেই নিজের মাথার চুল গুনতে বসে গেল। গোপাল একটু চতুর। সে ভাবল যে মাথার সব চুল কাটিয়ে ফেললেই আর গোনাগুনির ব্যাপার থাকবে না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সে এক নাপিতের কাছে গিয়ে মাথার সব চুল কেটে একেবারে ন্যাড়া হয়ে এল।

পরদিন সকালে তারা দুজনেই রাজসভায় হাজির হলো। যথাসময়ে রাজা রাজসভায় এসে সিংহাসনে বসলেন। তারপর প্রথমে ভবেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভবেশ, তোমার মাথায় কটি চুল আছে? ভবেশ মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে রাজামশাই, আমার মাথার সব চুল এখনো গুনে শেষ করতে পারিনি।

রাজামশাই এরপর গোপালের দিকে তাকিয়ে বললেন, গোপাল? গোপার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজের নেড়া মাথাটি দেখিয়ে বলল, আজ্ঞে, রাজামশাই, আমার মাথায় একটাও চুল নেই।

গোপালের কথা শুনে রাজামশাই অত্যন্ত পুলকিত হয়ে বললেন, দারুণ, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমানরে মতো উত্তর দিয়েছ। এখানে প্রমাণ হলো তোমার বুদ্ধিই বেশি। সারা সভা হাততালিতে ফেটে পড়ল।

ভবেশ এতে একটু মনক্ষুণ্ণ হলো বটে কিন্তু আবার দুজনে বন্ধু হয়ে গেল।

সপ্তর্ষি রায়, পঞ্চম শ্রেণী

জাতীয় উদ্যান

সিমলিপাল

সিমলিপাল জাতীয় উদ্যান ওড়িশা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এটি মূলত বাঘ সংরক্ষণাগার। এই উদ্যান ২৭৫০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে। উদ্যানের মধ্যে একটি পাহাড় ও ১২টি নদী রয়েছে। ২টি জলপ্রপাত রয়েছে। এই উদ্যানে ১ হাজার ৭৬ রকমের উদ্ভিদ রয়েছে তাতে ৯৬ রকমের অর্কিড দেখা যায়। এই উদ্যানে অংসখ্য ঔষধি ও সুগন্ধী উদ্ভিদ রয়েছে যা স্থানীয় জনজাতিদের আয়ের উৎস। এই উদ্যানে ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৪২ প্রজাতির পাখি এবং ৩০ প্রজাতির সরীসৃপের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্তন্যপায়ী জন্তুজানোয়ারের মধ্যে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, এশিয়ান হাতি, সম্বর হরিণ, বার্কিং হরিণ, গৌড়, বনবেড়াল, বন্যশুয়োর, চার শিংওয়ালা হরিণ, বড়ো কাঠবেড়ালি সাধারণ ল্যাঙ্গুর। পাখির মধ্যে লাল জঙ্গল পাখি, পাহাড়ি ময়না, ময়ূর, আলেকজান্দ্রিন, প্যারাকিট, বড়ো ঈগল, ধূসর হর্নবিল প্রভৃতি।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৫৯

পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গে চ সমান:
অহং –বয়ং (আমি--আমরা)
অহং যুবক: – বয়ং যুবকা: ।
(আমি যুবক– আমরা যুবক)
অহং শিক্ষক: – বয়ং শিক্ষকা: ।
প্রযোগং কুর্ম: --
ভক্ত:, দরিদ্র:, শিষ্য:,নায়ক:, দাস: ।
অহং বালিকা– বয়ং বালিকা: ।
(আমি বালিকা – আমরা বালিকা)
অহং লেখিকা–বয়ং লেখিকা: ।
প্রযোগং কুর্ম: –
যাত্রিকা, পাচিকা, কন্যা,কন্যকা, ধনিকা,ভৃত্যা।

ভালো কথা

থানার গাছে বকের বাসা

এবার আমার পরীক্ষা শেষ হলে মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ি গিয়েছিলাম। সাতদিন ছিলাম। আমার মামার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার খাতড়াতে। খাতড়া পুলিশ থানার মধ্যে বড়ো বড়ো গাছগুলিতে অনেক বক বাসা করেছে। সব বাসাতেই ছানা রয়েছে। মা-বক ছানার মুখের ভেতর ঠোঁট ঢুকিয়ে ছোটো ছোটে মাছ উগরে দিচ্ছে। দেখলাম অনেক ছানা আবার মাটিতে পড়ে গিয়েছে। থানার পুলিশকাকুরা সেই ছানাগুলিকে একটা জায়গায় রেখে দিয়েছে। মা বক মাটিতে নেমে এসে সেই ছনাগুলিকে খাইয়ে যাচ্ছে। বকগুলি পুলিশকাকুদের একেবারেই ভয় করছে না।

শৈবাল রায়, সপ্তম শ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

অন্তহীন বিকেল

শ্রুতি খামারু, দশম শ্রেণী, হাওড়া

বিকেল হয়েছে সূর্য ঢলেছে পশ্চিমে,
কাকেরা নিজের নীড়ে ফিরছে
ক্লান্ত পথিকের বেশে,
পড়ন্ত বিকেলে আকাশ সোনালি হয়ে
আছে,
এমন সময় সে বাড়ি ফিরল সারা দিনের
শেষে।
চারপাশটা একবার চেয়ে দেখল
এক ক্লান্ত দৃষ্টি
নিঃশব্দ উঠোনে এক শূন্যতার সৃষ্টি।
না আজ আর দৌড়ে আসবে না কেউ,
ঘুরবে না পায়ের কাছে একটু স্নেহ পাবার
আশে।
তার সবথেকে প্রিয় সাথী ছোট্ট পোষা
বেড়াল
তার সাথে কেটে যেত কত অবসর কাল।
ছুটাছুটি ধরাধরি কত হাসি আনন্দ,
সব স্মৃতি আজ মনের মধ্যে আবদ্ধ।
আজ জুতো খুলে ঘরে ঢুকে
বন্ধ করে দিল সে দরজা—
বাইরে সূর্য ডোবে, আঁধার নামে ধীরে,
ভেতরে স্মৃতিরা সব ভিড় করে আসে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বিবিধতার মাঝে একতাই সত্য : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

আজ এই সমাবেশ দেখে সঙ্ঘের সঙ্গে পরিচিত নয় এমন ব্যক্তিবিশেষের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আজ তো কোনো উৎসব বা পার্বণ নেই, না তো সঙ্ঘের কোনো

উৎসব? এমন কোনো বিষয় না থাকা সত্ত্বেও এত প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে সারি সারি মানুষ বসে আছেন। কীসের জন্য এই সমাগম? মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম, শহর, জেলা থেকে প্রত্যেক কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক স্ব-উদ্যোগে ,নিজ ব্যয়ে, বহু বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে আজ এখানে সম্মিলিত হয়েছেন। কীসের টানে? সঙ্ঘ কী করতে চায়? এর উত্তর একটাই। সঙ্ঘ সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজের সংগঠন করতে চায়। হিন্দুসমাজের সংগঠন কেন? কারণ, একমাত্র হিন্দুসমাজই হচ্ছে এই দেশের দায়িত্বশীল সমাজ। আপনারা ঋষি অরবিন্দের অমৃতবচন শুনলেন—

'ভারত কেবল একটি ভূখণ্ড নয়, এটি এক জীবন্ত শক্তি, এক মা, এক আদর্শ, এক ধ্রুব সত্য।'

অর্থাৎ ভারতবর্ষ কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক একক নয়, রাজনৈতিক কারণে ভৌগোলিক সীমানার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। ভারত এক 'স্ব-ভাব'-কে পারিভাষিত করে। এই স্বভাব যারা আত্মস্থ করতে পারেনি তারা এই ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে পৃথক দেশ গঠন করেছেন। আর যারা বিচ্ছিন্ন না হয়ে থেকে গিয়েছেন তারা ভারতের স্ব-ভাব গ্রহণ করেই থেকে গিয়েছেন।

ভারতের এই 'স্ব-ভাব' ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর উদ্ভব হয়েছে তেমন নয়। এই স্ব-ভাব বহু প্রাচীন। যখন থেকে এই বিশ্বের ইতিহাস চোখ মেলেছে, এই ইন্দো ইরানীয় প্লেটের ওপর অবস্থিত ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রত্যেকটা মানুষ বুঝতে শিখেছেন, তারা এই স্ব-ভাবের অধিকারী। এই স্ব-ভাব কী? এই স্ব-ভাবটি হচ্ছে বিশ্বের বিবিধতাকে স্বীকার করে চলার মানসিকতা। আর তাই-ই হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। সবারই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। হিন্দুরা জানে যে এই বিবিধতার মধ্যে একতাই সত্য। এই একতাই একাত্মতার মাঝে সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার প্রকাশ ঘটায় যা চিরন্তন ও শাশ্বত। সৃষ্টির আদিতে যেমন ছিল, আজও তেমন আছে, ভবিষ্যতেও তেমনটাই থাকবে। এর কোনো পরিবর্তন নেই। বাকি সবকিছুই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তিত রূপ সেই একেরই অভিব্যক্তির প্রকাশ। আজকাল মানুষ বিবিধতার মাঝে একতা খুঁজে পান, কিন্তু হিন্দুরা বহু আগে থেকেই একথা জানেন যে, একেরই প্রকাশ বিবিধতায়। একতারই আকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সহ ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। সেই কারণে আমাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা এবং স্বকীয়তাকে সম্মান করে চলা উচিত। মানুষকে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিহিসেবে নয়, একজন আদর্শ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ হিসেবে জীবন নির্বাহ করতে হবে। যেহেতু একজন ব্যক্তি একটি

ফঃ ৬

পরিবার গঠন করে, সেই পরিবার সমাজ গঠন করে। সমাজ সৃষ্টি হয় মানবতার প্রয়োজনে। একজন মানুষের আবার সারাজীবন সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদান চলে। সেই কারণে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সখ্য সেই আদিকাল থেকেই বর্তমান। এই সখ্য গড়ে উঠেছে সুস্থ পরিবেশ গঠনের মাধ্যমে। মানুষের সংখ্যা বাড়লে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন হতে থাকবে তাতে বিতর্কের কিছু নেই। প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও গুণবত্তা রয়েছে। একের গুণ অন্যের গুণবত্তা বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে কাজ করলেই সমাজ সুন্দরভাবে বিকশিত হয়। একইভাবে, ক্ষমতার বিকাশও অনুরূপ পথ অনুসরণ করে। একের ক্ষমতা যদি অন্যের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়, তবে সেই মহৎ মিথস্ক্রিয়া এক অপূর্ব সুন্দর সমাজ গঠন করতে সাহায্য করে।

আমাদের দেশে রাজা-মহারাজাদের কথা এখন খুব একটা আলোচিত হয় না। ভুলেই গেছেন অনেকে। কিন্তু সেই রাজাকে আজও আমাদের দেশের মানুষ মনে রেখেছে যিনি শুধুমাত্র তার পিতাকে দেওয়া কথার মর্যাদা রক্ষার্থে চোদ্দ বছর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। সেই রাজারই আরেক ভাই যিনি একজন স্বনামধন্য রাজা, আমাদের দেশ তাকেও মনে রেখেছে, কারণ তিনি সেই দাদার পাদুকা সিংহাসনে রেখে চোদ্দ বছর দেশ চালিয়েছিলেন এবং দাদা ফিরে আসার পর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব সুন্দরভাবে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

আমাদের দেশে ধনবানেরও অভাব নেই। ধনীদের সম্পর্কেও খুব একটা আলোচনা হয় না। তবে সেই ধনবান মানুষটির কথা আমাদের দেশে বিশেষভাবে মনে রেখেছে যিনি হলদিঘাটের যুদ্ধের পর স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রাণা প্রতাপকে তার যাবতীয় ধনসম্পদ দান করেছিলেন। তিনি ভামা শাহ। তাই কে কত আয় করল, আমাদের দেশে তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই, যদি না তার সেই বিশেষ স্ব-ভাব বর্তমান থাকে।

কারণ আমাদের দেশ সেই কপর্দকশূন্য মানুষটিকে আজও মাথায় করে রেখেছে, যিনি তাঁর মাকে শেষবয়সে আর্থিক সাহায্য করতে পারেননি। তাঁর মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য খেতরির রাজা টাকা পাঠাতেন। সেই মানুষটি স্বামী বিবেকানন্দ। তার নাম শোনেননি ভারতবর্ষে এমন মানুষ খুব কমই আছেন।

এই যে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার স্ব-ভাব, এটা একধরনের বোধ, যাকে বলা হয় ভারতবোধ। এই স্ব-ভাব না থাকলে তাকে ভারতবোধ বলা চলে না। এই বোধ আদিপুরুষের সময়কাল থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে যারা এই বোধ বয়ে নিয়ে চলেছেন, তারাই হিন্দু। এই হিন্দুসমাজ ও ভারতবর্ষ একই শব্দের নামান্তর। কারণ হিন্দুসমাজ সমগ্র ভারতবর্ষের বিবিধ সংস্কৃতিকে একসুতোয় গেঁথে একই ছন্দে চলার চেষ্টা করে চলেছে। আজকের এই সামাজিক অবক্ষয়ের কালেও হিন্দুরা এই নীতি মেনে চলেছে।

'মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু, যঃ পশ্যতি স
পণ্ডিতঃ।।'

অর্থাৎ পরনারীর প্রতি মায়ের মতো (শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিতে) দেখা, পরের সম্পত্তিকে মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ মনে করা এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই নিজের আত্মার প্রতিফলন দেখা। যে কথা বা ব্যবহার অপরকে দুঃখ প্রদান করে, সেই ব্যবহার আমি অপরের প্রতি কখনোই করব না। যে ব্যক্তি জীবনকে এইভাবে দেখে, সেই-ই সত্যিকারের জ্ঞানী ও পণ্ডিত।

আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ শুধু নয়, সারা বিশ্বের সমগ্র হিন্দু সমাজ এই নীতিতে বিশ্বাসী। কেউ কেউ পালন করেন, কেউ কেউ হয়তো পালন করতে পারেন না। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে এই বোধই ধ্রুবসত্য। এটাই ভারতবর্ষের মূল পরিচয়। এ তো সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, কোনো দেশের রাষ্ট্রচরিত্র গঠিত হয় সেই সমাজের চরিত্র অনুযায়ী। সুতরাং ভারতবর্ষকে যদি পরম বৈভবশালী বানাতে হয় তবে দেশের শাসক, প্রশাসক, মহাপুরুষ, নেতা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিসমূহের ভাবনাচিন্তা ও কার্যসম্পাদন সেই শুদ্ধ রাষ্ট্রনীতির সহায়ক হওয়া উচিত। দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে সামাজিক পরিবর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইংল্যান্ড কীসের শক্তিতে লড়াই করে জিতল? তাদের সৈন্যবল কিছুই ছিল না, নেতারাও মানসিকভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু জনসমাজ হারেনি। তারা মানসিকভাবে দুর্বল ছিল না এবং লড়াই করার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। সেই শক্তিতে ইংল্যান্ড জয়লাভ করে। এ ছিল সমাজের শক্তির সামর্থ্য।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষের সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংযুক্ত থেকে বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যারা তৎকালীন সমাজ সংস্কারক ছিলেন তাদের সান্নিধ্যে এসে বিবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধীজী, লোকমান্য তিলক, ডঃ বিআর আম্বেকর, বীর সাভারকর, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ। সবার সঙ্গেই আলাপচারিতার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেন। এমনকী ভগৎ সিংহ, রাজগুরু, শুকদেবেরও সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সবার সঙ্গে কথা বলে এবং প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার সূত্রে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কাজের ক্ষেত্র আলাদা হলেও সবার উদ্দেশ্য এক। তা হলো স্বাধীন ও সংস্কারিত সমাজ তথা দেশ গঠন করা।

কেউ হয়তো স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কেউ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে, কেউ অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলোকে গ্রহণ করেছিলেন সংস্কারিত করার জন্য। কিন্তু এই পরাধীনতার সমস্যা যে বারে বারে ফিরে আসবে না তার নিশ্চয়তা কী? আর এটাই ছিল ডাক্তারজীর প্রশ্ন এবং গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কারণ ইতিহাসের পাতা যদি উলটে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে যে আলেকজান্ডারের সময় থেকে ভারতবর্ষে ঘনঘন আক্রমণ শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময়কাল পর্যন্ত। দেখা যায়, মুষ্টিমেয় কিছু বর্বর যারা গুণবত্তায় আমাদের সমকক্ষ নয়; ধনসম্পদহীন, শৌর্যে ও পরাক্রমে যারা আমাদের ধারে কাছেও নেই, তারা দেখতে দেখতে আমাদের দাস বানিয়ে

ফেলল। আর এই ঘটনা বারবার ঘটেছে আমাদের সঙ্গে। কোনো ভালো শিক্ষা আমরা এদের কাছ থেকে পাইনি শুধু বিশ্বাসঘাতকতার শিক্ষা ছাড়া। আর এই কারণেই এই সমাজের সংশোধন জরুরি ছিল। এই সংশোধনের কাজ যদি না হয় তাহলে আমাদের কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ হবে না। কোনো না কোনো ব্যক্তিকে এই কাজ করতে হবে। ডাঃ হেডগেওয়ার চিন্তা করেন স্বাধীনতা এবং অন্যান্য সংস্কারের কাজে অনেক বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্ব জড়িত আছেন এবং তারা দায়িত্বের সঙ্গে সে কার্য নির্বাহ করছেন। নতুন করে সে জায়গায় মাথা লাগানোর দরকার নেই। কিন্তু তাঁদের সমস্ত কাজের সম্পূর্ণতা নির্ভর করবে যে কাজের উপরে, সেই কাজ আমি করব। তিনি চিন্তা করেন ভারত সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিবিধতার মাঝে একতার বীজ বপন করেছে। ভারত একটিই দেশ ছিল। এ কোনো ইংরেজ দ্বারা বানানো দেশ নয়। 'হিন্দু স্বরাজ' পত্রিকায় গান্ধীজী কিছু প্রশ্নোত্তর লেখেন। তাতে দেখা যায়, এক যুবক প্রশ্ন করছে এবং এক বৃদ্ধ তার উত্তর দিচ্ছেন। যুবক প্রশ্ন করলেন, ভারতবর্ষকে কীভাবে এক করব? বৃদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন, ভারতবর্ষ তো একই। ব্রিটিশরা এসে ভারত ভাগ করেছে। ব্রিটিশরা আসার আগে ভারত একই ছিল। বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা, জাতি, আচার ইত্যাদির পরম্পরা, ধারা ও বৈচিত্র্য ভারতবর্ষকে বহু প্রাচীনকাল থেকেই একই সুতোয় বেঁধে রেখেছিল, কারণ সংস্কৃতি সবার এক ও চিরন্তন। প্রত্যেকের ধমনীতে বয়ে চলেছে হিন্দুর রক্ত। আর এই সংস্কৃতির কারণেই আমাদের হিন্দু বলা হয়। এটাই আমাদের পরিচয়। এই পরিচয় কোনো বিশেষ পন্থ বা সম্প্রদায় বা আচার অনুসরণকারীর নাম নয়। কোনো বিশেষ ভাষার নাম নয়। ভারতবর্ষে বসবাসকারী ভাষাবৈচিত্র্যে সম্পৃক্ত সকল মানুষ, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বসবাসকারী সকল মানুষ একটাই তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্ব হচ্ছে বিবিধতার মধ্যে একতা। একতাই জীবনের সাক্ষাৎ পরম লক্ষ্য। তাই একতার বাঁধন অটুট রাখতে উপভোগ নয়, সংযমই একমাত্র পথ। সুখ বাইরে নয় সুখ আছে অন্তরে। তাকে ভেতরে খোঁজা প্রয়োজন।

আপামর ভারতবাসীর মধ্যে যে অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে, তা সম্মাননা নির্ভর। সুতরাং ভারতবর্ষ এক। আর এই সকল তত্ত্ব উপস্থাপন করলেই মানুষের কাছে তা হিন্দুত্বের সংজ্ঞা হিসেবে প্রত্যয় হয়। কারণ হিন্দু শব্দটির সঙ্গে এই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই হিন্দু সমাজকেই আমাদের সংগঠিত করতে হবে। হাজার সমস্যা থাকবে এবং তা অত্যন্ত সুসময়েও থাকে। জীবনপথে প্রতিটি সময়ে বিভিন্ন বাধাবিপত্তি পেরিয়েই যেতে হয়। ঠিক তেমনটাই ছোটো বড়ো সমস্যার উপস্থিতি সামাজিক জীবনেও প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে মূল বিষয় হচ্ছে সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য আমরা কতখানি প্রস্তুত? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও সাত্যকির সঙ্গে দৈত্যের যুদ্ধ এবং অহংকারের পরিণাম উদাহরণ হিসেবে মনে রাখা জরুরি।

আমাদের দেশে বহু সমস্যা আছে। অবশ্যই সমস্যা থাকবে। বিশ্বের কোন দেশে সমস্যা নেই? কিন্তু সমস্যা থাকাটা বড়ো বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে সমস্যার সমাধান বের করা। সেই কাজটাই আমাদের করতে হবে। আর এই কাজ করতে গেলে নিজেদের সংস্কারিত হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে একতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই কাজে স্বার্থান্বেষণ করলে চলবে না। কারণ সঙ্ঘ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কাজ করে না।

আমরা গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করছি। যার কাছ থেকে নিচ্ছি তাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি। ভারতবর্ষ আমাদের জননী। তার জন্যই আমরা জীবনপণ কাজ করছি। আমাদের কোনো প্রত্যাশা নেই। আমাদের যা অর্জিত ধন তা সম্পূর্ণভাবে মায়ের আরাধনায় উৎসর্গীকৃত। আমাদের জীবন তার কাজে আহুতি দেবার জন্য—'তেরা বৈভব অমর রহে মা, হাম দিন চার রহে না রহে'।

আমাদের একতার ভিত্তি হলো 'আত্মীয়তা'। হিন্দু সমাজে প্রত্যেকের মধ্যে অপার আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। এই বিশ্বের সকল মানুষকে হিন্দুরা আত্মীয় বলে মনে করে। বসুধৈব কুটুম্বকম্ শ্লোকটি তারই ব্যাখ্যা দেয়। হিন্দুসমাজের মধ্যে এই আত্মীয়তাবোধ অনুঘটকের কাজ করে বলেই সঙ্ঘকাজের ভিত্তি শুদ্ধ সাত্তিক প্রেম। এই প্রেম স্বার্থের জন্য নয়। এই প্রেম সাধনার (ধ্যেয়) পথ। পরং বৈভবং নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রম্। দেশ যখন বৈভবশালী হবে, তখন ভারত তথা এই হিন্দুসমাজ তথা হিন্দু রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে বসুধৈব কুটুম্বকম্।

ভারত বড়ো হলে সারা বিশ্ব বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। যারা ভারতের শত্রু তাদের সঙ্গেও ভারত বন্ধুত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। ইতিহাস তার সাক্ষী। বাকি সবাই স্বার্থের কথাই চিন্তা করে। আমরা শুধুমাত্র সম্পর্কের কথা চিন্তা করি। কারণ আমাদের প্রেমের ভিত্তি হচ্ছে ধ্যেয়নিষ্ঠা। সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে, হিন্দুধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে আমাদের এই ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে—এটাই আমাদের ধ্যেয়। এটাই আমাদের সাধনা। আমাদের আর কোনো প্রত্যাশা নেই। মানসম্মান, ধন্যবাদ, প্রতিষ্ঠা, পদ, রাজনীতি ইত্যাদি কিছুই চাই না। শুধুমাত্র এই সাধন পথে চলার জন্য আমরা নিজেদের এই অনুশাসনে বেঁধে রাখি। যার কারণে সম্পর্কের বিস্তার, বাঁধন ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি পায়। ছোটো বড়ো ভুল-ত্রুটি, স্বভাব বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। দেখা যায় মানুষের আত্মীয়তা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এই গণ্ডি অতিক্রম করে তাদের আত্মীয়তার বৃত্ত আরও বিস্তার করে। এই ধরনের কাজে সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতিতে অভ্যাসে পরিণত করেছেন। শুধুমাত্র সঙ্ঘ মানসিকতা থাকলেই চলে না, রোজ শাখায় অংশগ্রহণ, শারীরিক অভ্যাস ও ছোটো ছোটো বৌদ্ধিক চর্চা এবং বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে সম্পর্কের সমন্বয় গড়ে তোলা হয়। এতে পারস্পরিক আত্মীয়তার মেলবন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং আত্মোৎসর্গের স্বভাব ও সমভাব বিকশিত হয়। সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজের মধ্যে এই আত্মীয়তা, সমতা

ও সমরসতার ভাব, দেশহিতে জীবন-মৃত্যুর এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক গড়ে তোলার মানসিকতা তৈরি করার পদ্ধতির নামই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

সঙ্ঘ এক জায়গায় কখনো থেমে থাকেনি। ক্রমাগত বিস্তার লাভ করে শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। ১৯২৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে তার জয়যাত্রা। ধীরে ধীরে তার বিস্তার হয়েছে সমাজে। শক্তি বেড়েছে। অগণিত স্বয়ংসেবক নির্মাণ করে রাষ্ট্রহিতে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করেছে। তারা বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংগঠন তৈরি করেছেন। এক লক্ষ তিরিশ হাজারেরও বেশি ছোটো বড়ো বিভিন্ন সেবা প্রকল্পে স্বয়ংসেবকরা আত্মনিবেদন করেছেন। সরকারি সাহায্য ছাড়া তারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী, সামাজিক শক্তির ভরসায় প্রাণ দিয়ে এই সংগঠনকে আগলে রেখেছেন। শিক্ষা, ক্রীড়া, শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে তারা সুসংহত, সুস্থ ও গঠনমূলক স্বভাব ও বোধ নির্মাণে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। কেন করছেন? করছেন দেশহিতে, যাতে সংস্কারের মাধ্যমে সুস্থ ও সুষ্ঠ শৃঙ্খলার বাতাবরণে সমগ্র দেশের সামাজিক স্বভাব এক সূত্রে গ্রথিত থাকে। করছেন এই কারণে যাতে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের সার্থক যোগদান থাকে। সঙ্ঘের দীক্ষা, বিচার, শিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় সম্পৃক্ত একজন স্বয়ংসেবক। তার সারা জীবন দেশহিতে উৎসর্গীকৃত থাকে। সঙ্ঘের কাজ হচ্ছে এই ধরনের স্বয়ংসেবক নির্মাণ করা। সঙ্ঘের কাজকে উপলব্ধি করতে হবে। বহু শতক পরে ভারতবর্ষে এই কাজ হচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ভগবান গৌতম বুদ্ধের পর প্রথম এই সার্বিক স্বভাব নির্মাণের কাজ দেশজুড়ে হচ্ছে। সঙ্ঘের এই কার্যপদ্ধতিকে উপলব্ধি করতে গেলে সময়ের প্রয়োজন। যাদের মনে হচ্ছে সমাজে এই কাজ প্রবলভাবে বাড়তে থাকলে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ নষ্ট হবে, তারাই সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন ও বাধা প্রদান করেন। সঙ্ঘ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে কোনো কোনো ব্যক্তি অজ্ঞতা বশে দুর্নাম ছড়ায়। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনারা সঙ্ঘকে বাইরে থেকে দেখে কোনো ধারণা করবেন না। সঙ্ঘকে না জেনে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না। সঙ্ঘের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সঙ্ঘকে জানুন, সঙ্ঘকে চিনুন, সঙ্ঘে যোগ দিতে হলে কোনো চাঁদা লাগে না। কোনো ঔপচারিক পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছা হলে আসুন, সঙ্ঘকে প্রত্যক্ষ করুন। ভালো না লাগলে সঙ্ঘ ছাড়তে পারেন। এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা। একাজ শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেমনির্ভর কাজ। এই কাজে কোনো স্বার্থসিদ্ধি হবে না। উলটে আপনার যা আছে সব কিছু দিতে হবে। আমাদের শাখায় সবসময় একটি তালিকা তৈরি হয়। মরাঠি ভাষায় তাকে বলা হয় 'ইয়াদি'। আমাদের এক সঙ্ঘচালক বলতেন 'ইয়া' অর্থ 'আইয়ে' আর 'দি' অর্থ 'দিজিয়ে'। এখানে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটাই সঙ্ঘের বিশেষত্ব। সঙ্ঘকে জেনে অনুভব করা যায় না। সঙ্ঘকে দূর থেকে দেখলে ভুল ধারণাই হবে।

অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো সঙ্ঘকে বাইরে থেকে দেখে অনুভব করা যায় না। সঙ্ঘকে না দেখে, না উপলব্ধি করে যারা বিভিন্ন রকম মতামত দেন, তাদের আমি সঙ্ঘে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সঙ্ঘের কাজ করুন, ভালো লাগলে সঙ্ঘের কার্যকর্তা হন। দেশের কাজ করুন। সমগ্র হিন্দু সমাজ যাতে দেশের উত্থানে কাজে লেগে যান, সেটাই সঙ্ঘের লক্ষ্য। সঙ্ঘের বিস্তার বিশাল। দেশের কোণে কোণে আজ সঙ্ঘের উপস্থিতি ঘটেছে। সত্তর হাজারের কাছাকাছি শাখা আছে সঙ্ঘের। সঙ্ঘ আজ বিশ্বের সবচাইতে বড়ো সংগঠন। তবুও আমরা কেন আরও বিস্তার চাইছি? বলাবাহুল্য, আমাদের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়। আমাদের নাম না থাকলেও চলবে। সমগ্র সমাজ এককভাবে এই গুণবত্তাতে সম্পৃক্ত থাকুক, এই আমাদের মূল লক্ষ্য। তবেই হবে দেশের উত্থান। বিশ্বের কাছে আজ দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। আর সেই কারণেই সমগ্র দেশবাসীর জীবনে শুদ্ধতা নিয়ে আসার এই ব্রত। সমগ্র সমাজে শৃঙ্খলা নিয়ে আসা এবং ভারতকে সর্বোত্তম রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি করে বিশ্বের মধ্যে এক শান্তিময় পরিবেশ তৈরি করা—এই তিন লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটাই পথ। সেই পথের পথিক হতে আপনাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

(মধ্যবঙ্গ প্রান্তের স্বয়ংসেবক সমাবেশে পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালকের বৌদ্ধিকের সারাংশ)

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

বাংলাদেশ কোন পথে যেতে চায়, তা স্পষ্ট হচ্ছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশ কোন পথে এগোচ্ছে? পাকিস্তান আফগানিস্তান, নাকি ইরান, নাকি অন্য কোনো ইসলামি দেশ? গত বছরের জুলাই-আগস্টে জেহাদি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ড. মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের কাণ্ডকারখানা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান দেখে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী মানুষ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা নতুন বাংলাদেশের যাত্রাপথ নিরূপণের চেষ্টা করছিলেন। সাত মাসের মাথায় সকল হিসেব-নিকেশ সহজ করে দিয়েছে কয়েকটি ঘটনা।

পাকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'বাংলাদেশ আমাদের হারিয়ে যাওয়া ভাই'। তিনি আগামী এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সফরে আসছেন হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এই সফর নিয়ে কথা বলতে এখন ঢাকা সফর করছেন।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক 'ডিফেন্স পাকিস্তান' নামে একটি সংস্থা গত ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বুলডোজার দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে দেওয়ার পর উল্লাস প্রকাশ করে এবং তাকে বিশ্বাসঘাতক নামে উল্লেখ করে। এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে এটা প্রকাশ করা হয়।

পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির আমির হাফিজ নাছম উর-রহমান সম্প্রতি লাহোরে

দলের এক সম্মেলনে বলেছেন, 'বাংলাদেশ আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছে, ওটা পূর্ব পাকিস্তান ছিল পরে বাংলাদেশ হয়ে যায়। ওটা আর পূর্ব পাকিস্তান থাকবে না, এক পাকিস্তান হবে, ইনশা আল্লা'।

কয়েকদিন আগে পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের শীর্ষ নেতা মানজুর আহমেদ মেঙ্গাল দলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশ কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাবে। বাংলাদেশ আপনাদের অপেক্ষায় আছে। ওটা পূর্ব পাকিস্তান ছিল, পরে বাংলাদেশ হয়েছে। ওটা আর বাংলাদেশ থাকবে না।' মেঙ্গাল গত জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন, কয়েকটি দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে করেছেন। সিলেট-সহ বিভিন্ন জেলায় ইসলামি মাহফিলে বয়ান দিয়েছেন। তিনি এক সময় বালোচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

গত বছর ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার জেহাদি আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা

ঢাকা ত্যাগ করার পর থেকে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভায় মহম্মদ আলি জিন্নাকে বাংলাদেশের প্রকৃত জাতির পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর একটি অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় প্রেসক্লাবে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে, এ ঘটনাগুলোর কোনোটারই প্রতিবাদ হয়নি। না সরকারের তরফ থেকে, না কোনো রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে। বুদ্ধিজীবীরা চুপ।

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তার মধ্যেই খবর আসে চাল ও নানা পণ্য নিয়ে কয়েকটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা বলছেন, তারা ভারতের ওপর নির্ভরতা কমাতে চায়।

এবার এদিকে তাকানো যাক। জেহাদি অভ্যুত্থানের পর ড. মহম্মদ ইউনুস দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র ইসলামের চর্চা বেড়ে গেছে। গত ৫ আগস্ট থেকেই হিন্দুদের ওপর হামলা শুরু হয়। বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের অপহরণ, হত্যা ও ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদ এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করে অথবা দায়ের করার হুমকি দিয়ে চাঁদাবাজি, প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী থেকে হিন্দুদের নির্বিচারে চাকরিচ্যুত করা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-সহ সারাদেশে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। আর এই হামলা নির্যাতন হয়রানি করা হচ্ছে 'আওয়ামি লিগের সঙ্গে হিন্দুরা জড়িত' এই তকমা লাগিয়ে। বিভিন্ন এলাকায় দেশত্যাগের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অথচ ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার এবং বিএনপি, জামায়াত-সহ রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে না, এগুলো অপপ্রচার। বিশেষ করে ভারত সরকার ও ভারতীয় মাধ্যমের।

তবে ধীরে ধীরে এই জেহাদি গণঅভ্যুত্থানের পেছনের দরজা খুলে যাচ্ছে, সামনে আসছে নানা ষড়যন্ত্রের খবর। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খবরটি হচ্ছে, বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হাসিনা সরকারের পতন ঘটাতে ইউএসএইড-কে ব্যবহার করেছেন। অর্থ ঢেলেছেন অকাতরে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে বাংলাদেশে কোনো সংস্থাকে ২৯ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছে।

এ কাজে সহায়তা করেছে ড. মহম্মদ ইউনুসের প্রতিষ্ঠান এবং মার্কিন দূতাবাস। ছাত্র নেতাদের তৈরি করা হয়েছে কয়েক বছর ধরে, এ ব্যাপারে মূল ভূমিকায় ছিল জামায়াতে ইসলামি। দ্বিতীয় সারিতে হেফাজতে ইসলাম ও বিএনপি। ছাত্র নেতারা মূলত আইএস (ইসলামিক স্টেট)-এর সক্রিয় সদস্য আর তাদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটি করেছে পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। ছাত্র নেতারা, যারা পরে সমন্বয়ক বলে নিজেদের দাবি করছেন, কাজ করেছেন শাসক আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লিগের ভেতরে থেকে কর্মী হিসেবে। শাসকরা কিছুই বুঝতে পারেননি। শেখ হাসিনার গোয়েন্দারা হয় ব্যর্থ হয়েছেন, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।

শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের দিন ৫ আগস্ট ছাত্র সমন্বয়করা তো প্রথমে বাংলাদেশের নতুন স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করেছিল। পরে বলা হয় দ্বিতীয় স্বাধীনতা। এক ছাত্র-সমন্বয়ক তো বলেই ফেলেছিলেন, একাত্তরের যুদ্ধ (তারা মুক্তিযুদ্ধ বলে না) ছিল দুই ভাইয়ের ভুল বোঝাবুঝি, ভারত মাঝখান থেকে সুযোগ নিয়েছে। আরেক ছাত্র- সমন্বয়ক বলেছেন, একাত্তরে অনেক মুসলমান ভুল করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য দায়সারাভাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ স্বীকার করা হচ্ছে। একাত্তর স্বীকার করে না জামায়াত, তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর পাশে ছিল, নির্বিচারে বাঙ্গালি হত্যায় সহায়তা করে। বিএনপি মুক্তিযুদ্ধ স্বীকার করে তাদের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কারণে। জিয়া সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করেছিলেন। সেই হিসেবে বিএনপি জিয়াউরকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে। মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার করলে প্রতিষ্ঠাতাকেও অস্বীকার করা হয়।

একাত্তরে তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। কয়েক লক্ষ নারী নির্যাতিত হয়েছিলেন, যাদের অনেকে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলায়। এক কোটিরও বেশি মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থী হয়েছিল ভারতের মাটিতে। বাংলাদেশে গত বছরের ছাত্র-জনতার জেহাদি অভ্যুত্থানে তাদের হিসেবে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে ১৪০০ মতো, যদিও এ পর্যন্ত ৪০০ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আহত কয়েক হাজার। কিন্তু এটাকেই একাত্তরের চেয়ে বড়ো করে দেখানো হচ্ছে।

মূলত বাংলাদেশকে পাকিস্তান করার চেষ্টা চলছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মানে শেখ মুজিব, ভারত আর ইন্দিরা গান্ধী। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনাকে বিতাড়িত করার পর ধানমন্ডি ২ নম্বর সড়কে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সারাদেশে মুজিবের ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়, ভাস্কর্যের মাথায় প্রস্রাব করা হয়। অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যও ভাঙচুর করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য ভাঙা হয়েছে সারাদেশে। তার মধ্যে 'সাত বীরশ্রেষ্ঠ'ও রয়েছেন। সর্বশেষ গত ৫ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ৫ আগস্ট চালানো হয়েছিল, অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। সর্বশেষ হমলায় দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির কাঠামো গুঁড়িয়ে দিতে সরকারের বুলডোজার ব্যবহার করা হয়। জানা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারের একজন ছাত্র উপদেষ্টার নির্দেশে এই বুলডোজার পাঠানো হয়। শেখ মুজিবুর ও ইন্দিরা গান্ধীর অপরাধ তাঁরা পাকিস্তান ভেঙেছেন। এখন স্পষ্ট, একাত্তরের পরাজয় পাকিস্তান ভোলেনি। তাদের বাংলাদেশি দোসররা ভোলেনি।

বোঝা যাচ্ছে, ছাত্র-জনতার জেহাদি অভ্যুত্থানের লক্ষ্য শেখ হাসিনার শাসনের অবসান নয়, শেখ পরিবারকে নির্মূল এবং ভারতের বিরুদ্ধে বৈরী অবস্থান গড়ে তুলে একদিকে পাকিস্তান এদিকে বাংলাদেশ থেকে ঘিরে ধরে চাপে ফেলা। বাংলাদেশের নতুন শাসকরা ধরে নিচ্ছেন, এ ব্যাপারে তারা চীনকে পাশে পাবেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুরকে সপরিবারে হত্যার পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসাজসে ভারত বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে বসে ভারতের বিরুদ্ধে বৈরী তৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন। ২০০১ সালে নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর এই সহযোগিতা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। অসমের উলফা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জন্য ১০ ট্রাক অস্ত্রের চালান এসেছিল চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। পাকিস্তান থেকে এই অস্ত্র এসেছিল বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর জাহাজে। তবে দুই পুলিশের তৎপরতায় এই অস্ত্রের চালান ধরা পড়ে যায়। তারা সরকারের নীতিগত অবস্থান জানতো না। পরে দুজনকেই বরখাস্ত করে বিএনপি-জামায়াত সরকার।

অন্তর্বর্তী সরকারের নাম বদলের পদক্ষেপ

ড. মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও নানা সংস্থা থেকে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ পাওয়ার পর সবাই তড়িঘড়ি নাম পরিবর্তন করতে নেমে পড়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবুর ও শেখ হাসিনার নাম বিভিন্ন আবাসিক ভবন প্রশাসনিক ভবন থেকে বাদ দিয়েছে। একই সঙ্গে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কবি জীবনানন্দ দাস ও লালন সাঁইয়ের নামও পরিবর্তন করা হয়েছে, সেখানে ইসলামি চিন্তাবিদদের নাম

ছাত্র-জনতার জেহাদি অভ্যুত্থানের লক্ষ্য শেখ হাসিনার শাসনের অবসান নয়, শেখ পরিবারকে নির্মূল এবং ভারতের বিরুদ্ধে বৈরী অবস্থান গড়ে তুলে একদিকে পাকিস্তান এদিকে বাংলাদেশ থেকে ঘিরে ধরে চাপে ফেলা।

প্রতিস্থাপিত হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নাম পরিবর্তনের ঘটনা ঘটছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আবাসিক ভবনের নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পিকার ফজলুল কাদের চৌধুরীর নামে রাখা হয়েছে। তিনি একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সক্রিয় সহযোগিতা করায় স্বাধীনতার পর মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ হাসিনা হলের নাম পরিবর্তন করে 'জুলাই-৩৬ হল', বঙ্গবন্ধুর ছোটো ছেলে শেখ রাসেলের নামে রাখা হলের নাম 'শহীদ আনাছ হল', শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম 'শাহ আজিজুর রহমান হল', বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী) হলের নাম 'উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা হল' এবং আনবিক বিজ্ঞানী ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনার স্বামী) বিজ্ঞান ভবনের নাম 'ইবনে সিনা বিজ্ঞান ভবন' করা হয়েছে। শাহ আজিজুর রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোতালেব মালিকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার সদস্য হন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসঙ্ঘের পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

নারী স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছেন বেগম রোকেয়া। বিভিন্ন স্থানে বেগম রোকেয়ার ছবি কিংবা ভাস্কর্য হয় ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোথাও কালি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। রংপুরে বেগম রোকেয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে (৮ মার্চ) শেখ হাসিনা সরকার বরেণ্য নারী নেত্রীদের বেগম রোকেয়া পুরস্কারে ভূষিত করতেন। ড. ইউনুস এই সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন।

বাংলাদেশে ৫ আগস্টের পর অসংখ্য মাজারে হামলা কিংবা অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। লালন অনুসারী কিংবা বাউলদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে। এখন কুষ্টিয়ায় লালন আখড়ার দিকে নজর পড়েছে।

বাঙ্গালি সংস্কৃতির ওপর হামলা

৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হামলা হচ্ছে। ঢাকায় নাট্যোৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে নাট্যচর্চা বন্ধ করতে নাটক মঞ্চায়নের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার রবীন্দ্রচর্চার প্রতিষ্ঠান 'সুরের ধারা'র কার্যালয় ও সংগীত শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য ঢাকায় পূর্ববর্তী সরকার একটি জায়গা বরাদ্দ করেছিল, ড. ইউনুস তা বাতিল করেছেন। নাট্যচর্চা ও বাউলদের অনুষ্ঠানে বাধা সহ্য করতে না পেরে বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমির মহানির্দেশক পদত্যাগ করেছেন। □

ভ্রম সংশোধন

স্বস্তিকার গত ১০ মার্চ সংখ্যার ৩৩ নং পৃষ্ঠায় 'সত্য ও সুন্দরের মিলন বিন্দু শিব'-শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ভুলবশত লেখকের নাম রতন চক্রবর্তী বলে প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধটির লেখক হলেন পিন্টু সান্যাল। এই ত্রুটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

—সঃ স্বঃ

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৯)

যুদ্ধজয়

মাথার উপরের ছাদই সরে গেল অতএব এই যে তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে তাতে সন্দেহ কী? শাসন করার কেউ নেই, তাই বড়ো ভাই মহাদেব নিজের মতো চলতে শুরু করলো। জীবনযাত্রা যেন লাগামছাড়া হয়ে উঠলো। সীতারাম, কেশব প্রতিবাদ করলে ভর্ৎসনা ছাড়া কিছু জুটত না। ঘরের কাজকর্ম রান্নাবান্না সব ছোটো দুই ভাইকে করতে হতো। মাঝে মাঝেই তাদের অভুক্ত থাকতে হতো। ছেঁড়া জামা কাপড় পরেই চলতো তারা। এই দুঃসময়ে সীতারাম ছোটোভাই কেশবকে সব সময় আগলে রাখতেন। খাওয়ার ব্যবস্থা না হলে নিজের খাওয়া থেকে তাকে খাওয়াতো। এর মধ্যেই পড়াশোনাও চলছিল। শ্রেণীতে প্রথম না হলেও পাঁচজনের মধ্যে কেশব ছিল একজন। বন্ধুরা খুব ভালোবাসতো তাকে। দুঃখের মধ্যে এটাই ছিল আনন্দের, সে ছিল সবার মধ্যমণি।

কেশব দেখতে তো সুদর্শন নয়, শ্যামবর্ণ, মুখে বসন্তের ছাপ, কিন্তু তার সরলতা, নিষ্ঠা, ভালোবাসার টান ছিল অমোঘ। সকলকে নিয়ে বেড়ানো, সাঁতার কাটা যুদ্ধজয়ের খেলা ছিল অন্যতম। সেই ছিল নেতা। নাগপুরে শুক্রবারের দীঘির পাশে একটা টিলা ছিল। হঠাৎ দেখা গেল সেখানে দু'দল সৈন্যের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য এরা সব বালক সেনা। একদিকে গৈরিক পতাকা আর একদিকে সবুজ পতাকা। একটা শিবাজীর দল, একটা মুঘলের। 'হর হর মহাদেব' শিবাজীর জয়ধ্বনিতে ভরে উঠতো আকাশ। মুখ দিয়ে হতো কাড়া নাকাড়া বাজার শব্দ। আর খেলনা তরোয়ালে ফণীমনসার মাথা কেটে হতো মুঘল সৈন্যের বধ। দীর্ঘ যুদ্ধের পরে মরাঠার জয়ধ্বনিতে গৈরিক পতাকা উড়িয়ে ফিরতো তারা। প্রায় প্রতিদিনই এ ছিল তাদের সব চেয়ে প্রিয় খেলা। খেলা হলেও তার আবেশ মনের গভীর স্পর্শ করতো। তাই যুদ্ধের পরে সন্ধ্যায় উভয় দলের কয়েকজন সেনা পা কেটে, ছড়ে, মচকে বাড়ি ফিরতো। সেনাপতি থাকতো কেশব।

(১০)

সীমোল্লঙ্ঘন

১৯০৭ কী ০৮ সালের ঘটনা। বিজয়াদশমীর দিন রামপেয়ালী গ্রামের বাসিন্দারা নতুন পোশাকে সেজে ঢাক-ঢোল, শিঙা, নাকারা আদি নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সীমোল্লঙ্ঘনের শোভাযাত্রা নিয়ে চলছিল। সীমোল্লঙ্ঘন হচ্ছে শিবাজীর দেশে তথা মরাঠাজাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত একটা অনুষ্ঠান। মূল বিষয় যুদ্ধ জয়ের ভাবনাকে মনে উজ্জীবিত রাখার জন্য এক একটি গ্রামের মানুষজন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে এমন শোভাযাত্রা করে গ্রামের সীমার বাইরে (উল্লঙ্ঘন করে) কোনো মন্দিরের সামনে যেত। পূজা ইত্যাদির সঙ্গে হতো রাবণ বধের (দহন) অনুষ্ঠান। তারপরে সকলে বাড়ি ফিরতো। বাড়ি ফেরার পথে সকলে সোনা ও রুপার প্রতীক রূপে কোনো দুটি গাছের পাতা সংগ্রহ করতো। যেমন শমী গাছের পাতা হলো সোনা আর 'যবের পাতা রুপা। অর্থাৎ তারা যুদ্ধে বিজয় লাভ করে সোনা-রুপা নিয়ে ফিরেছে। বাড়িতে ফিরে ছোটোরা গুরুজনদের প্রণাম আর সমবয়সীরা আলিঙ্গন করতো। দশহরা উৎসবে রামপেয়ালীতে সীমোল্লঙ্ঘনের তেমন শোভাযাত্রা চলেছিল, সামনে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, তরুণ কিশোর, বাজনদার আর সরকারের পুলিশ। চারিদিকে তখন স্বাধীনতা বিপ্লবের তাপ বিকরিত হচ্ছিল। এতে ইংরেজ পুলিশ সাবধান তো থাকবেই, শোভাযাত্রা লক্ষ্য করলে দেখা যেত এবার শোভাযাত্রায় তরুণ যুবক যেন বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছে, আর তাদের মধ্যমণি কেশবরাও হেডগেওয়ার।

প্রকৃতপক্ষে কেশব এসেছে কাকার বাড়ি রামপেয়ালীতে। দাদার ব্যবহারে বাড়ির আকর্ষণ কমে যাচ্ছিল। তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন নেতার কথা শুনে 'কেশরী' পত্রিকায় স্বদেশ জাগরণের নানা নিবন্ধ পড়ে। বিভিন্ন গুপ্ত বৈঠকে যোগদান করে তার মধ্যে স্বাদেশিকতার ভাব যেন প্রকাশের পথ খুঁজছিল। মাঝে মাঝে কাকা আবাজীর (মোরেশ্বর শ্রীধর হেডগেওয়ার) বাড়িতে আসতো। এখানে এসে কয়েকদিন থাকার ফলে তার ভালোবাসা ও আকর্ষণের কারণে বন্ধু জুটিয়ে নিত, তাদের কাছে তুলে ধরতো, স্বাদেশিকতা, দেশের জন্য কর্তব্য কর্মের কথা। এবারও তার সঙ্গী হয়েছে নরহরি সিংহ ঠাকুর, ভাগোরে ডবীর প্রমুখ। এরা সবাই হাজির রয়েছে এই শোভাযাত্রায়। শোভাযাত্রা গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার আগেই কেশব ধ্বনি তুললো— 'বন্দেমাতরম্', সঙ্কেত মতো সকলের কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হলো 'বন্দেমাতরম্', রারণ বধের স্থানে পৌঁছে সবাই একটু স্থির হতেই কেশব বন্ধুদের নিয়ে রাষ্ট্রগীত শুরু করলো। তারপরে সে নিজেই ভাষণ দিতে শুরু করলো রাবণ বধের প্রকৃত অর্থ কী! হঠাৎই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, ভাষণ শুনে সরকার, অফিসাররা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কোনোমতে শেষ হলো অনুষ্ঠান গ্রামের সবাই বাড়ি ফিরতে ফিরতে এই কাজের প্রশংসা করলো কিন্তু ভয়ও পেল অনেকে, নিশ্চয়ই পুলিশি তৎপরতা শুরু হবে। হলোও তাই। কেশব তো শুধু গতানুগতিক রাবণ বধের চেতন্যহীন কার্যক্রমে এক জাগরণ বার্তা দিয়ে প্রকৃত সীমোল্লঙ্ঘন করিয়ে ছিলেন। পুলিশের উপর মহলে খবর পৌঁছতেই রাজদ্রোহ মামলা চালাবার চেষ্টা হলো। কিন্তু ভাণ্ডারার স্বনামধন্য শ্রীপুরুষোত্তম সীতারামদেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রুস্তমজীর সঙ্গে দেখা করে এসব বালকোচিত কাজ বলে একে গুরুত্ব না দিতে অনুরোধ করেন এবং বুঝিয়ে সুঝিয়ে মামলা করা থেকে নিরস্ত করেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে।